প্রহেলিকা-সিরিজের দ্বাবিংশ গ্রন্থ

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

মাঘ—১৩৫২

দাম—এক টাকা

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শঙ্কর গুলি ছুঁড়ল বৈজ্ঞানিকের দিকে

পৃঃ—১১২

হাওয়ার পেছনে

এক

ক'দিন ধরে খবরের কাগজ খুলতেই চোখে পড়ে সেই বীভৎস কাহিনী। আজও খবরের কাগজ খুলতেই শঙ্করের চোখে পড়ল সেই নরমুণ্ডের কথা। আজকে শুধু নরমুণ্ডই নয় তার সাথে আবার পাওয়া গেছে পুলিশের বেঁটে মহেন্দ্রকে—মৃত অবস্থায়! এতদিন শঙ্করের কাছে এ-কাহিনী শুধু হাস্যকর মনে হয়নি, মনে হয়েছে অবিশ্বাস্য। দিনের বেলা ভৌতিক কাণ্ডের মতই আজগুবী!

কিন্তু এখন আর হাস্যকর বা অবিশ্বাস্য ভাবতে সে পারে না। নরমুণ্ডের ব্যাপারটা দিন-দিনই কেমন যেন জটিল আর রহস্যময় হয়ে উঠছে! সেই গভীর রহস্যের মাঝে যেন হিম-শীতল কঠিন স্পর্শ সে অনুভব করে!

দিনের পর দিন ব্যাপারটা বেড়েও যাচ্ছে হু-হু করে। যেমনি অদ্ভুত তেমনি বীভৎস! প্রায় প্রত্যহই শেষ-রাতের দিকে যখন শেষ গাড়ীটা বর্দ্ধমান হতে হাওড়ায় এসে পৌঁছায়,

তখন দেখা যায় যে, কোন খালি কামরায় হয়তো পড়ে আছে একটা প্যাকেট।

খোল প্যাকেট। দেখতে পাবে একটা নরমুণ্ড, তাজা একটা নরমুণ্ড! রোজই যে পাওয়া যায়, ঠিক তা নয়। মাঝে-মাঝে দু-একদিন বাদও যায়। কিন্তু মোটের উপর তা অতি তুচ্ছ। বলতে গেলে মাসের পঁচিশ-ছাব্বিশ দিনই হচ্ছে এ নিত্য-নৈমিত্তিকের ব্যাপার। আজ নিয়ে প্রায় আশিটি নরমুণ্ড পাওয়া গেছে। কিন্তু এতদিন কোন পুলিশের লোক মারা যায়নি। তদারক-কার্য্যে মহেন্দ্র ছিল একজন সুদক্ষ সহকারী; তাকে মৃত অবস্থায় আজ পাওয়া গেল।

শঙ্করের মত দুঃসাহসী ডিটেকটিভ্‌ও ঘেমে ওঠে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য, কোন নরমুণ্ডর চোখে-মুখেই কোন ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই! মরেছে যেন তারা হাসতে-হাসতে, আনন্দের মাঝে! কিন্তু সম্মুখে মৃত্যুর রূপ দেখতে পেয়েও মানুষের চোখে-মুখে, তার অবয়বে, ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠবে না—এ অসম্ভব! না—সব ব্যাপারটাই মাকড়সার জালের মত নিরবিচ্ছিন্ন প্যাঁচালো। একটার পর একটা জাল যেন ছড়িয়ে পড়েছে!

শঙ্কর ভাবতে চেষ্টা করে এর কোন একটা কূল-কিনারা পাওয়া যায় কিনা! সে খবরের কাগজটা ভাল করে আবার পড়ে নিল। কিন্তু না, কোন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সমস্ত ঘটনাটাই অস্পষ্ট অথচ সত্য। দুষ্কৃতিকারীদের ধরতে না পারার জন্যে, কাগজওয়ালারা পুলিশকে যাচ্ছে-তাই গালিগালাজ

পর্য্যন্ত করতে সুরু করেছে। কাগজওয়ালাদের বিরুদ্ধ-মন্তব্যকে শঙ্কর অহেতুকও বলতে পারে না। ঠিকই ত! দিনের পর দিন যাচ্ছে, আর ক্রমশঃ নিশীথ রাত্রির অবগুণ্ঠনের নিচে মৃত্যুর পটভূমিকায় তারা উপহার পাচ্ছে শুধু নরমুণ্ডের মালা! বিরুদ্ধ-মন্তব্য হবে না কেন তবে?

অবশ্য এ-হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের ভার তার উপর নয়; কিন্তু তারই বিভাগের নিন্দা বা সুখ্যাতির সাথে সেও জড়িত। তাছাড়া, তাদেরই একজন সহকর্ম্মীও প্রাণ হারাল! এসব কারণেই ইদানীং শঙ্কর নরমুণ্ডর ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। আর একথাও সে ভাবতে রাজি নয় যে এর কোন দায়িত্বও তার নেই। কিন্তু নিজের উপরে যে কাজের ভার রয়েছে, আপাততঃ সে সেদিকেই নজর দিতে বসলো।

সেও আর এক মজার ঘটনা। সেন্ট্রাল হস্পিটালের শব-ব্যবচ্ছাদাগার হতে সেদিন সন্ধ্যাবেলা একটি মৃতদেহ কে বা কারা সরিয়ে ফেলেছে! প্রায় মাসখানেক কঠিন পরিশ্রম করে সবে সে একটা হদিস পেয়েছে এতদিনে। শব-ব্যবচ্ছাদাগারের দরজায় যে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তার সাথে তাদের রেকর্ডের হাতের ছাপের সাথে মিলেও গেছে একরকম হুবহু!

ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে শঙ্কর সেই হাতের ছাপ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে বসল। না, হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু সেই ভয়ঙ্করী শীতলা ভৈরবীর হাতের ছাপ কি করে শব-ব্যবচ্ছাদাগারে গিয়ে পড়লো, শঙ্কর তা কিছুতেই ভেবে কিনারা

করতে পারছে না। সে ত' জেলের মধ্যেই মারা গেছে বছরখানেক আগে!

শঙ্কর চুপ করে ভাবতে লাগল।

এমন সময় এলেন ব্রজেন্দ্র। ব্রজেন্দ্রবাবু পুলিশ-বিভাগের পাকা ঘুঘু। ডিটেকটিভের কাজ করে-করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছেন প্রায়। নরমুণ্ডর ব্যাপারটার ভার তাঁরই উপর। বেঁটে মহেন্দ্র ছিল তাঁরই সহকারী। ভদ্রলোক একেই ত বুড়ো হয়ে এসেছেন, তার উপর যে ক'গাছি চুল তবু বা এতদিন কালো ছিল, এ কেস হাতে নেওয়ার পর তাও পাকতে সুরু করেছে। দিনে-রাতে তাঁর ঘুম হয় না; বিশেষ করে মহেন্দ্রর মৃত্যুতে বেশ দমে গেছেন খানিকটা—বোধহয়, ভয়ে ও দুর্ভাবনায়।

শঙ্কর ব্রজেন্দ্রকে দেখে বলল, "এস ব্রজেনদা! তারপর তোমার তদন্তের কতদূর? চা হবে নাকি?"

ব্রজেনদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আর চা! তা আনো।"

বলে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখে-মুখে কেমন যেন একটা উদাস ভাব! তার মাঝে অস্পষ্ট ভীতির চিহ্ন ফুটে বেরুচ্ছে।

শঙ্কর হাসল। হেসে বলল, "তা দাদাকে যে বড্ড কাহিল দেখছি! ব্যাপার কি?—বৌদি···

ব্রজেনদা বললেন, "তোমাদের কেবল ফোক্করী-ইয়ার্কী

আর ফাজলামী! এদিকে আমার অবস্থা যে গতাসু। খবর রাখ কিছু?—আজও তিনটে! মহেনও নেই।"

চোখ দিয়ে ব্রজেনদার টস-টস করে জল পড়ছে।

শঙ্কর বলল, "দেখলাম ত তাই কাগজে।"

ব্রজেনদা নিস্তেজ ভঙ্গীতে বললেন, "তা ত দেখবেই, সবাই দেখছে। মুখ রইল না আর কারো কাছে আমার। ভাবছি বয়সও হয়ে এল—এবার মানে-মানে রিটায়ার্ড হয়ে বসি।"

শঙ্কর বলল, "বল কি দাদা! এত সকালেই? হদিস শেখাবে, আমরা পাকা হব—তবে না তোমার ছুটি! আর আমাদের ভরা গাঙ্গে ডুবিয়ে চলে যেতে চাও? কিন্তু আমি পড়েছি আর এক মুশকিলে। শীতলা ভৈরবীর কথা মনে আছে ত দাদা?"

ব্রজেনদা বললেন, "মনে আছে মানে? তাকে দিয়েই ত আমার হাতেখড়ি—বেটি মরেছে না হাড় জুড়িয়েছে!"

শঙ্কর ফাইল খুলে ফিংগার-প্রিণ্টের রেকর্ড দেখিয়ে বলল, "মরেই যদি থাকে তবে তার ছাপ এল কি করে এখানে?"

ব্রজেনদা অনেকক্ষণ হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "সাতাশ বছর পুলিশে কাজ করছি। এমনতর ঘটনা আমার চোখে পড়েনি ভাই! কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে তোমার কেস আর আমার কেস দুটোর কোথায় যেন যোগসূত্র রয়েছে! শীতলা ভৈরবী যে মরেছে, সে-কথা সত্য।"

শঙ্কর বলল, "তাহলে শবাগারের ছাপ মিথ্যে?"

ব্রজেনদা বলতে লাগলেন, "না, মিথ্যে বলতে পারিনে। এক হাতের ছাপ যখন অন্য হাতের সঙ্গে মেলে না, তখন মিথ্যে বলি কি করে? কিন্তু ভায়া, এসবের ভেতর আর আমি নেই। আমার দ্বারা এতদিনেও যখন কিছু হলো না, তখন আর আমার দ্বারা হবার আশাও দেখছিনে। একদিন ছিলরে দাদা, যখন ভয় পেতাম না—কিন্তু এ-ব্যাপারে যত এগুচ্ছি ততই কেমন যেন ভয় হচ্ছে! সাহেবের কাছে এসব কথা বলাও চলে না। তার চেয়ে মানে-মানে সরে পড়ি—সেই ভাল। কি বল তুমি?"

ব্রজেনদার মত পাকা ঘুঘুও তাহলে ভয় পেয়েছেন! তাঁর অন্যতম সহকারীকে হারিয়ে খানিকটা ভেঙ্গেও পড়েছেন যেন! ব্রজেনদা যখন রিটায়ার্ডের সুর তুলেছেন, তখন থাকবেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু কি উত্তর দিবে শঙ্কর?

শঙ্কর চুপ করে রইল।

দুই

খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম যে করবে, শঙ্করের সে সময়ও এখন নেই। তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে পড়ল। রেকর্ড-রুমের কতকগুলি পুরানো কাগজপত্র দেখা দরকার।

অফিসে যেতেই অফিস-ইন্‌স্পেক্টারের কাছে শঙ্কর শুনল বড়সাহেব দু-তিনবার তার খোঁজ করেছেন এবং বলেছেন যে শঙ্কর এলেই যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শঙ্কর বলল, "কেন?"

অফিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, "তা জানিনে। তাছাড়া সাহেব আজ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না। তা দেরী করো না, যাও।"

"যাই", বলে শঙ্কর এসে ঢুকল কমিশনারের ঘরে।

সত্যিই বড়সাহেব আজ দস্তুরমত গম্ভীর। সমস্ত চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া। তিনি একদৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ; বসতে বলতে খেয়াল পর্য্যন্ত নেই তাঁর আজ। দেখা হতেই হেসে "হ্যালো, ইয়ং মেন", বলে হাত বাড়িয়ে দেবার কথা বুঝি মনেই নেই তাঁর!

একদৃষ্টিতে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বড়সাহেব। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, "বস।"

শঙ্কর বসল।

সাহেব বললেন, "নরমুণ্ডর ব্যাপারটা সম্বন্ধে কি মনে হচ্ছে তোমার ?"

কি উত্তর দেবে শঙ্কর ? এর আগা-মাথা সে কিছুই জানে না—নিজের ফাইল নিয়েই ব্যস্ত। বলল, "এ-বিষয়ে কিছু যে না ভেবেছি তা নয়—কিন্তু কোন মীমাংসায় আসতে পারিনি স্তার !"

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, তোমার সেই কেসের কতদূর ? হাতের ছাপ মিলুলে ?"

শঙ্কর বলল, "মিলিয়েছি স্তার !"

সাহেব আরো উত্তর শোনার জন্যে তাকালেন শঙ্করের দিকে।

শঙ্কর বলতে সুরু করল, "আশ্চর্য্য স্তার, গত বছর মরেছে শীতলা ভৈরবী—কিন্তু এসব চুরির ব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে তার হাতের ছাপ !"

সাহেব বললেন, "সেণ্ট্রাল হস্‌পিটালের লাশ-কাটা ঘর হতে শব-চুরির ব্যাপারটা আর নরমুণ্ডর ব্যাপারটা, দুটোই অত্যন্ত জটিল।"

শঙ্কর বলল, "ট্রেণের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে শুধু মুণ্ডগুলিই পাওয়া যাচ্ছে—দেহটা থাকে না। শব-ব্যবচ্ছাদাগারের ব্যাপারে মুণ্ডটা নেই, দেহটা আছে, আর আছে মৃত ভৈরবীর হাতের ছাপ। দেখা যাচ্ছে, দুটো ব্যাপারই পাকা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হচ্ছে।"

সাহেব কিছুক্ষণ ভাবলেন। বললেন, "আমার কাছেও ঠিক তাই মনে হচ্ছে—সমস্ত ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই হচ্ছে। কোন বৈজ্ঞানিক এর মধ্যে আছে বলেই আমারও ধারণা।"

সাহেবেরও এ-ধারণা কেন হলো, একথা ঘুরিয়ে কোনভাবে জিজ্ঞাসা করবে কিনা শঙ্কর ভাবছে, এমন সময় সাহেব কলিং বেল বাজালেন।

আর্দ্দালী আসতেই তাকে কি আনতে যেন আদেশ করলেন তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বড় কাঠের ট্রেতে করে একটি নরমুণ্ড বড়সাহেবের ঘরে এনে হাজির করা হলো। নরমুণ্ডটির চুলের সাথে লেবেল দিয়ে পুলিশের রিপোর্ট আঁটা। কখন কোথায় কিভাবে পাওয়া গেছে, ওর মধ্যে সেই সব বিস্তৃত সংবাদ।

এখনও নরমুণ্ডটি একেবারে তাজা। কয়েক ঘণ্টা আগেও এ লোকটা জীবিত ছিল। রক্ত জমাট বাঁধবার পর্য্যন্ত সময় পায়নি।

বড়সাহেব আর শঙ্কর দুজনেই হতভাগ্য সেই লোকটির কথা ভাবতে লাগলেন।

ট্রে হতে সন্তর্পণে নরমুণ্ডটি হাতে তুলে নিয়ে সাহেব শঙ্করকে বলতে লাগলেন, "ধর, এটির কথাই। আজ প্রাতে পাঁচটার ট্রেণে হাওড়া ষ্টেশনে একে পাওয়া যায়। দেখে বোঝা যাচ্ছে,

হত্যা করা হয়েছে একে আমাদের হাতে আসবার কিছু আগে। ধর, ঘণ্টা দুই আগে। অথচ যে কম্পার্টমেণ্টে ওকে পাওয়া গেল, সে কম্পার্টমেণ্ট যে একেবারে খালি ছিল তাও নয়—সে কোঠায়ই আমাদের পুলিশের লোক ছিল। কিন্তু সে কিছুই জানে না। সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে, শেষ-রাতের দিকে সব যাত্রীই কেমন যেন বিস্মৃতির নেশায় জড়িয়ে পড়ে! সঠিক কোন বিবরণ কেউই বলতে পারে না। তাহলে একে কে হত্যা করল, কেনই বা হত্যা করল, লাশ গেল কোথায়, এসব নানান প্রশ্নই আছে। আরো আশ্চর্য্য, দেখ এ মুখের মধ্যে কোন আতঙ্কের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই! ভাবতে পার তুমি শঙ্কর যে সামনে তোমার মৃত্যুকে দেখেও তুমি আনন্দ করবে?"

শঙ্কর তাকিয়ে দেখল। মৃত মুণ্ডটির মুখে উজ্জ্বল হাসির চিহ্ন লেগে আছে। মিষ্টি আনন্দে তার মুখখানা সজীব সুন্দর। মৃত্যুকে সে আলিঙ্গন করেছে বন্ধুর মত ভালবেসে।

শঙ্কর বলল, "আমাদের লোক নিশ্চয়ই এ মৃত লোকটির কামরায় ছিল, সে কি বলল?"

সাহেব হাসলেন।

সাহেবের মুখে এতক্ষণে একবার হাসি দেখা গেল তবু! কিন্তু সে হাসি ম্লান। নিতান্তই বেদনার।

সাহেব বললেন, "শুধু একটিতেই নয়, ট্রেণের প্রত্যেক কম্পার্টমেণ্টেই আমাদের লোক থাকে। কিন্তু রাত দু-তিনটার সময় তাদের জ্ঞান থাকে না, তারা কিসের স্পর্শে শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ে—চারদিকে তারা আনন্দের সুর শুনতে পায়।

আর যখন তাদের নেশা ভাঙ্গে, তখন দেখতে পায় সম্মুখে নরমুণ্ড।”

সাহেব একটু চুপ করে আবার বলতে লাগলেন, “বুঝলে শঙ্কর. যারা এ কাজ করছে—এক কথায় তারা ভয়াবহ। অথচ দেখ, দেহ হতে ধড় সরিয়ে নিয়েছে, যেন শাণিত ব্লেড দিয়ে কাগজ-কাটার মতন করে অত্যন্ত আলগোছে! দেখছ না জোর করে তাদের কেউ হত্যা করেনি। তা করলে মাংস-পিণ্ডের মধ্যে উঁচু-নীচু মাংস থাকতই ; কিন্তু তা নেই। এজন্যই বলছি যে তোমার ধারণা হয়ত ঠিকই যে এ-দুষ্কার্য্যের পিছনে রয়েছে কোন জ্ঞানী বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক।”

বড়সাহেব চেয়ার হতে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরময় পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। তারপর শঙ্করকে ইঙ্গিতে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

এঘরে প্রকাণ্ড সব বড়-বড় স্পিরিটে ভেজানো কাচের জারের মধ্যে সারি-সারি এতদিনকার পাওয়া সব মুণ্ডগুলি সাজান রয়েছে।

দেহ ও মস্তকগুলি যেন ঘুমুচ্ছে সব! মুখের শেষ হাসি এখনও মিলোয়নি ওদের!

বড়সাহেব একটা তাকের কাছে শঙ্করকে নিয়ে বলতে সুরু করলেন, “এসব মৃত মুণ্ডগুলির একটারও সন্তোষজনক কোন কৈফিয়ৎ জনসাধারণকে আমরা দিতে পারলাম না। গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ক্ষেপে গেছে। অথচ মেডিকেল এক্‌জামিনেশনে কোনও কিনারা হলো না—কি ভাবে এদের হত্যা করা হয়েছে!”

দুইজনে সেই মৃত কতকগুলি দেহাবশিষ্টকে সম্মুখে রেখে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল।

আকাশের বুকে তখন প্রখর ঘন রোদ। উপরের জানালা দিয়ে তারই কতকগুলি রেশ ঘরে এসে পড়েছে। ওপাশে পাহারাদার হাবিলদারের বুটের শব্দ শোনা যায়।

দূরে ঢং করে ঘড়িতে একটা বাজলো।

বড়সাহেব শঙ্করকে নিয়ে আবার নিজের ঘরে এসে বসলেন।

বড়সাহেব আজকার লোক নন। দীর্ঘজীবন তিনি পুলিশ-বিভাগের কর্ণধার, এবং জীবনের যে কোন কার্য্যে তিনি যশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁর যশের মাঝে ধীরে-ধীরে যেন কালিমা নেমে আসছে!

তিনি ধীরে-ধীরে বললেন, "ব্রজেন্দ্রকে দিয়েছিলাম এ-ব্যাপারে তদারক করতে। মহেনকে নিয়ে সে এগুচ্ছিলও মন্দ নয়। কিন্তু মহেনের মৃত্যুতে বড় দমে গেছে। আর তার মনে কি করে ঢুকে গেছে যে এ-ব্যাপারে সে কিছুই করতে পারবে না। আজকে সে দরখাস্ত পাঠিয়েছে রিটায়ার্ড করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।"

শঙ্কর ইতিপূর্ব্বেই স্বয়ং তার ব্রজেনদার কাছেই এমনি একটা ইঙ্গিতও পেয়েছিল। কিন্তু তা যে এত তাড়াতাড়িই তিনি করে বসবেন, তা শঙ্কর বুঝতে পারেনি।

সাহেব বলতে লাগলেন, "ওকে আমি আটকাব না।

দীর্ঘদিন ব্রজেন এ-বিভাগে সুনামের সাথে কাজ করেছে। আজ সে বৃদ্ধ। যৌবনের সে তেজও আজ নেই। তা ছাড়া এতদিনেও কিছু করতে পারেনি বলে নিজেরও মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থায় তাকে দিয়ে ভাল কাজ পাওয়া সম্ভবও নয়।

আমার ইচ্ছা, এর তদন্তের ভারও তুমিই গ্রহণ করো। অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই তুমি কাজ করবে।"

শঙ্কর বিস্মিত হয়ে বলল, "আমি ?"

সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, তুমি। তোমার বুদ্ধি আছে, তোমার সাহস আছে। তোমার পিছনে থাকবে সম্রাটের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাহচর্য্য।"

শঙ্কর বলল, "শব-চুরির ব্যাপারটা কি হবে স্যার ?"

সাহেব হাসলেন ঃ "একটা সূত্র যখন পেয়েছ তখন তারা আর পালাতে পারছে না। ওটা যেমন তোমার উপর আছে তেমনই থাক্। অবসর সময়ে ওটা দেখাশুনো করবে।"

একটু থেমে বললেন, "দুটোই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হচ্ছে। এরাই যদি নরমুণ্ডের নায়ক হয়, তাহলে এদের সাথেই সমস্ত দল ধরা পড়বে। আর নরমুণ্ডের দল যদি আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে মৃত শীতলা ভৈরবীর দলের উপর আমাদের দৃষ্টি রেখে পার পেতে চায়—তাহলে সেটাও বোঝা যাবে নরমুণ্ডর কার্য্যকলাপ দেখে।"

শঙ্কর বলল, "বুঝতে পেরেছি স্যার !"

সাহেব হাসলেন।

—"তুমি সুব্রত আর নারায়ণকে নিতে পার সহকারীরূপে —ওরা কাজের লোক হবে। তাদের কারো উপর ভৈরবীর আড্ডার ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে পার ইচ্ছা হলে। এটা হলো নিতান্তই গৌণ, এ নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই। আসল ব্যাপার হলো আমাদের নরমুণ্ডর ব্যাপার। সে ভারই আমি তোমার উপর দিতে চাই।"

শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমি ভার নিলাম স্যার!"

বড়সাহেব হাসলেন, বল্লেন, "বেশ! নারায়ণ আর সুব্রতকে বাদেও যখন যাকে খুশী—এমন কি আমাকেও—সম্পূর্ণ ভাবে তোমার সহকারীরূপে পাবে। আজ হতে এ-বিষয়ে আমি নিজেও তোমার সব আদেশ পালন করব।"

শঙ্কর সাহেবের প্রশান্ত মুখের দিকে তাকাল একবার। তার পর ধীরে-ধীরে বড়সাহেবের ঘর হতে বেরিয়ে এল।

তিন

মাথার উপর গভীর দায়িত্ব—যেন বিরাট মহা সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ লুকানো বরফের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ-ডুবি হয়ে গেছে—সেই উর্ম্মিমালার মধ্য দিয়ে তাকে আসতে হবে বালু-বেলায়! পথ জানা নাই—কোন্ পথে গেলে সাফল্য আসবে, তাও জানা নাই; তবু শঙ্করকে অগ্রসর হতে হবে।

না, শুধু ভাবলে তো চলবে না!—

জীবনে কোন দিন কোন কাজ করতে সে পেছুপাও হয়নি, আজও হবে না। ডিটেকটিভ্ লাইনে এসে কত দিন সে ভেবেছে যে, একটা ভাল কাজের সুযোগ পেলে হয়—যেখানে নিজের বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ সে দেখাতে পারবে! আজকে এসেছে সে সুযোগ।

এখন প্রয়োজন শুধু সাহসের।

অফিসের কাজগুলো তাড়াতাড়ি করেই সে সারলো। ব্রজেন্দ্রবাবু মহেনের সহায়তায় আজ পর্য্যন্ত যতদূর এগিয়েছেন, তার রিপোর্টগুলি পড়ে নিল—একবার বাড়ীতে নিয়ে ভাল করে পড়ে দেখতে হবে অবসর-সময়ে। কিছু-কিছু উপদেশ দিয়ে নারায়ণকে পাঠালো শীতলা ভৈরবীর আড্ডায়—তদারকে।

আরো যে সব টুক্‌টাক্ কাজ করার ছিল, সেগুলো সেরে শঙ্কর বেরিয়ে এল।

লালবাজার হতে বেরিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার দিয়ে এগিয়ে দক্ষিণে মোড় ঘুরে, শঙ্কর এসপ্লানেডের কাছে এসে হাজির হলো। কে যেন খুব নিকটেই শঙ্করকে একবার ডাকল মনে হলো! পিছন ফিরে দেখল, না—কেউ নয়, মনের ধাঁধা! বড়সাহেব 'শঙ্কর' বলে বহুবার ডেকেছেন; তারই সুর মনের মধ্যে পাকিয়ে রয়েছে এখনও!

শঙ্করের মাথায় নরমুণ্ডগুলির চেহারা কিল্‌বিল্‌ করছে। চোখের সামনে ভাসছে সে সব দৃশ্য! একদিকে কি বীভৎস, অন্য দিকে তেমনি মুখে তাদের হাসি! সাহেবের কথা যদি সত্য হয়,—শঙ্কর চলতে-চলতে ভাবতে লাগল—বড়সাহেবের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে রয়েছে কোন বৈজ্ঞানিক। অবশ্য নিজেও তাই সে বিশ্বাস করে। তাই যদি হয়, তাহলে সহসা এ ব্যাপারের সহজ-সাধ্য কিনারা হবে না। কারণ, বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে নিখুঁত ভাবেই তারা কাজ করেছে নিশ্চিত।

ভাবতে-ভাবতে সে এগিয়ে চলল মাঠের দিকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কত লোকের মিছিল চলছে রাস্তা দিয়ে! হাঁটতে-হাঁটতে সে চলল্‌ আউটরাম-ঘাটের দিকে।

রাস্তা দিয়ে লোকের চলেছে অবিরাম গতি। মাঠে খেলা ছিল বোধ হয়?

হ্যাঁ, মোহনবাগান আর ইষ্ট-বেঙ্গলের খেলা ছিল আজ। ড্র হয়েছে।

বাপরে বাপ্‌! সমস্ত সহরটাই যেন হাজির হয়েছে মাঠে!

এখনও নরমুণ্ডটি একেবারে তাজা।

[পৃঃ—৯

একদিন সেও খেলতে পারত ভালই। কিন্তু ডিটেকটিভ্ হওয়া অবধি আর তার সময় নেই এখন। কখন যে কোথায় বেরুতে হবে, পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার নিজেরই জানা থাকে না। এ যেন কোন দুর্গ পাহারা দেবার মত! প্রতি মুহূর্ত্ত বিপক্ষ-দলের গতিবিধি লক্ষ্য রেখে চলতে হবে।

শঙ্কর চলছে।

গাড়ী যাচ্ছে। বাইকে করেও লোক চলেছে—হেঁটেই অধিকাংশ। আরে! মোটর-বাইকটা যে তারি গায় এসে লাগছে!

—"কেমন মশাই আপনি?"—শঙ্কর বলল, "একেবারে উপর দিয়েই যে বাইক চালাতে স্নুরু করলেন! আরে···তুই অরবিন্দ? তুই?"

অরবিন্দ মোটর-বাইক হতে নেমে পড়ল: "আছিস কেমন?"

শঙ্কর বলল, "ভালই। অনেকদিন পর দেখা। তারপর তুই কেমন?"

অরবিন্দ বলল, "তবু যে কেমন আছি জিজ্ঞাসা করলি! আমি ত ভাবলাম চিনতেই পারবিনে! বউবাজার দিয়ে যাচ্ছি, দেখলাম লালবাজার হতে তুই বেরুচ্ছিস! ডাকলাম তোকে,—ডেকে-ডেকে সারা হলাম, সাড়াই দিলিনে! ভীড়ের মধ্যে ভিড়ে গেলি। তা ভাগ্য ভাল, বাইক করতে-করতে ভাগ্যে আজ এদিকেই বেড়াচ্ছিলাম, তাই দেখা হয়ে গেল!

অরবিন্দ হাসল।

মোটর-বাইকটা রেখে তারা এসে বসল মাঠের ঘাসের উপর।

এক চিনাবাদাম-ওয়ালাকে ডেকে শঙ্কর চিনাবাদাম কিনল কয়েক পয়সার। বলল, "খা। খেয়ে দেখ্। ওঃ, তোরা আবার সাহেব! আচ্ছা লোক তুই অরবিন্দ! না হয় প্রকাণ্ড নাম-করা লোকই হয়েছিস, তাই বলে দেখাই করবিনে বা কেন?"

অরবিন্দ বলল, "পুলিশে ঢুকে আচ্ছা উল্টো চাপ দিতে শিখেছিস দেখছি!"

শঙ্কর হাসল: "বাঃ, সে খবরও জেনেছিস তাহলে! কিন্তু চাঁদবদন, তুমিই বা ক'দিন আমার খোঁজ নিয়েছ শুনি? বিলেত হতে যে এসেছিস আজ ছ-সাত মাস ত বটেই! যাহোক্, দোষ তাহলে উভয়তঃ। দেখা হলো তোর সাথে, ভালই হলো। তুই ত মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক হয়ে এসেছিস—তোর কাছে যাব ভেবেছিলাম—দেখা হলো ভালই হলো।"

অরবিন্দ বলল, "বৈজ্ঞানিক না ছাই! বৈজ্ঞানিক ছিলেন আমাদের পুরাকালের লোকেরা। ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাতে পারতেন।"

দু বন্ধুতে হো-হো করে হেসে উঠল।

অরবিন্দ বলল, "আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হয় সে ত ভালই। আমি রাজি, এবারে চল উঠ। তারপর লাল-বাজারে গিয়েছিলে কেন হে? কে আবার পাকা ধানে মই দিল তোমার?"

না, অরবিন্দ ঠিক আগের মতই পাগলাটে আছে। অরবিন্দ, ওর ছেলেবেলাকার বন্ধু। ছেলেবেলা অরবিন্দ চব্বিশ ঘণ্টাই কি সব নিয়ে মেতে থাকত! কি প্রক্রিয়া করলে মানুষ অদৃশ্য

হয়ে যায়, এই হতে সুরু করে বটতলার ইন্দ্রজালের যে সব বই আছে, কোনটা পড়তেই সে বাদ রাখেনি। আর পরীক্ষা চালাত সে সকলের উপর। একটা আস্ত লেবু কেটে একদিন সবাইকে তার মধ্যে রক্ত দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিল। যাকে-তাকে ধরে-ধরে হিপনোটাইজ করতে পারত ঐ অল্প বয়সেই। পাগলাটে হলেও ওর বয়সি ছেলেরা একদিকে যেমন সমীহ করত তাকে, অন্যদিকে তেমনি করত ভয়।

এমনি কত রকম টুকটাক তুকতাক যাদুমন্ত্র সে পরীক্ষা করত নিজের মনে বসে-বসে। কিন্তু লেখাপড়ায় চিরকালই সে ছিল চমৎকার ছেলে। একেবারে তুখোড়! জলপানি পেয়ে-পেয়ে পাশ করল আই-এস-সি, তারপর বি-এস-সি, তারপর এম-এস-সি; এম্-এস-সি পাশ করে চলে গেল বিলাত, সেখান হতে ডি-এস-সি হয়ে ফিরে এসেছে। এখন ওর কত নাম—দেশ-বিদেশে কত সম্মান! অরবিন্দ এখন সমাজের দশজনের মধ্যে একজন!

কলকাতার বুকে রাত নেমে এসেছে। দুজনে উঠে পড়ল। অরবিন্দ বলল, "চলি এবারে তাহলে—কিন্তু কি দরকার বলছিলি—"

শঙ্কর বলল, "আচ্ছা, তুইত এসব নিয়ে বহুকাল নাড়া-চাড়া করেছিস, আর এখন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক হয়েছিস। বল্‌ত দেখি, মরা মানুষের দেহ দিয়ে কার কি কাজ হতে পারে?"

অরবিন্দ অকস্মাৎ একটু গম্ভীর হলো! বোধহয় ভাবছে!

তারপর তার চিরকালের পাগলাটে ভঙ্গিতে হো-হো করে হাসল একবার। হেসে বলল, “বাজে, বাজে, সব বাজে! মরা মানুষ দিয়ে আবার কার কি উপকার হবে? তুইও ত দেখছি পাগল হলি!”

শঙ্কর বলল, “আচ্ছা ধর, যদি মরা মানুষের দেহের সাথে অপর কোন মরা মানুষের মাথা সংযোগ করা যায়, তাহলে কোন প্রক্রিয়ায় তাকে বাঁচান যেতে পারে কি?

অরবিন্দ আবার কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর হয়ে রইল। নাঃ, অরবিন্দ ঠিক আগের মতই আছে। ছোটবেলা একবার দুটো ইন্দুর ধরে সে-দুটোর পা কেটে এটার পা ওটায়, ওটার পা এটায়, এমনি ভাবে উলটিয়ে লাগিয়ে কি-জানি-কি পরীক্ষা করতে-করতে ঠিক এমনিভাবেই ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে ছিল! সে কথা শঙ্করের আজও মনে পড়ে। এমনি করেই অরবিন্দ ভ্রূ কুঁচকে তাকাত যখন সে কাউকে করত সম্মোহিত।

ওদিকে অরবিন্দ হো-হো হাসতে সুরু করেছে। হেসে বলল, “শোন্, তাহলে একটা গল্প বলি শোন্। ফ্রান্সে আমার এক বন্ধু ছিল। লোকটা রাতদিন মদ খেত। তার সাথে রাস্তায় চলতে সুরু করলে আর কথা ছিল না, সে শুধু বিভিন্ন মদের কাহিনী শোনাতে বসত। তোর অবস্থাও তাই। কতদিন পর দেখা হলো, দুটো হাসির কথা বলবি, না মরা মানুষের ইতিবৃত্ত! পুলিশে ঢুকে অধঃপাতে গেছিস!”

অরবিন্দ আবার হো-হো করে হাসল।

ততক্ষণে সে মোটর-বাইকে উঠে বসেছে।

বাইকে উঠে সে বলল, "চললাম রে শঙ্কর আজ। যাস একদিন আমার ওখানে। কেমন? গুড্ নাইট্!"

শঙ্করও হাত তুলে বিদায়ের ভঙ্গীতে বলল, "গুড্ নাইট!"

ততক্ষণে মোটর-বাইক বহুদূরে চলে গেছে।

বেশ আছে অরবিন্দ। শঙ্কর নিজের মনে ভাবতে-ভাবতে চলতে লাগল, বেশ আছে ও। মানুষ জীবনে যা চায়, তাই ও পেয়েছে। যশের মালা আর প্রতিষ্ঠা, এই দুই-ই এসেছে ওর জীবনে। কাগজে দেখেছে কিছুকাল যাবৎ অরবিন্দ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কি করে মানুষ তার আয়ুকে বৃদ্ধি করে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে, এমনি কি সব ব্যাপার নিয়ে খুব গবেষণা করছে! গবেষণার ধারা ভারতীয় পদ্ধতিতে।

শঙ্কর মনে-মনে হাসল। আগের মতই আছে অরবিন্দটা, সেই ক্ষ্যাপাটে ধরণের। কিন্তু শঙ্কর ওকে আজও মনে-মনে খাতির করে অনেকখানি। নরমুণ্ডর ব্যাপারে ওর সাহায্য পেলে জয় তার নিশ্চিত। ওর কাছে আবার যেতে হবে আরেক দিন। ভাল করে জপিয়ে নিয়ে অরবিন্দর সাহায্য নিতেই হবে। আজকে কিছুতেই জপান গেল না—সব প্রশ্নই হেসে উড়িয়ে দিয়ে এড়িয়ে গেল। হাজার হোক, লণ্ডনের ডি-এস-সি. শঙ্করের মত ওছা ছেলের সাথে সায়েন্স নিয়ে সহসা আলোচনা করতে প্রবৃত্ত না হওয়াই ত সম্ভব।

চার

একটু এদিক-সেদিক বেড়িয়ে শঙ্কর বাড়ীতে ফিরে এল গোটা নয়েকের সময় রাতে। বাড়ীতে লোকজন ওর নিতান্তই কম। দূর-সম্পর্কের এক পিসিমা, তার আবার কিছুদিন হাঁপানীর রোগ ধরেছে। বাধ্য হয়ে শুয়েই থাকে বেশী সময়। আর আছে পিসিমার মেয়ে মীরা। এই নিয়ে শঙ্করের সংসার। মীরা পড়ে ভিক্টোরিয়ার সেকেণ্ড ইয়ারে। কিন্তু রোজই শঙ্করের কাছে খানিকটা ডিটেকটিভের গল্প শোনা চাই-ই।

শঙ্কর আসতেই মীরা দরজা খুলে দিল, "এত দেরী করলে কেন দাদা ?"

শঙ্কর বলল, "এই দেরী হয়ে গেল একটু। হ্যাঁরে, কেউ এসেছিল ?"

মীরা বলল, "কেউ আসেনি, এসেছে শুধু একটা পত্র। টাইপ-করা খামে। হাতমুখ ধুয়ে এস তুমি, খেতে বোস। ঠাকুর, ভাত বাড় তোমার দাদাবাবুর।"

হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল শঙ্কর। বলল, "আন দেখি পত্রটা মীরা !"

খেতে-খেতে বাঁ হাত দিয়ে পত্রটা খুলল শঙ্কর।

টাইপ-করা চিঠি। ছোট্ট পত্র। মাত্র কয়েকটি লাইন। সুন্দর চিঠির কাগজের উপর বিদ্যুৎ-প্রবাহের কয়েকটা রেখা। তাদের মাঝখানে একটা নরমুণ্ডর চিহ্ন। লাল—টক্‌টকে লাল !

লিখেছে: "খুনী ডাকাত এসব ধরার ব্যাপারে তুমি যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ। এ দ্বারা দেশের উপকার হবে সন্দেহ নাই। আমরা খবর পেলাম যে ইদানীং তুমি নরমুণ্ডর ব্যাপারে হাত দিয়েছ। ভাল করনি; কিন্তু তুমি তরুণ, তুমি সাহসী। তোমার জীবন আমরা নষ্ট করতে চাইনে, এই বুঝে আমাদেরও বিব্রত করতে চেষ্টা করো না।"

নীচে কোন নাম নাই।

শঙ্কর দু-দুবার পত্রটা পড়ল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পত্রটার দিকে।

মীরা জল আনতে গিয়েছিল। এসে দেখল, দাদা ভাত খাচ্ছে না। সে বিরক্ত হয়ে বলল, "ওকি! ভাত খাচ্ছ না যে! কিসের পত্র?"

শঙ্কর পকেটে রাখল পত্রটা। হেসে বলল, "কিছু নারে! কখন এল পত্রটা? ডাকঘরের সিল দেখেছিনে ত?"

—"তা কি করে দেখবে? সন্ধ্যার একটু পর এক দরোয়ান নিয়ে এল পত্রটা। পিওন-বুকে সই করে পত্রটা রেখেছি।"

শঙ্কর বলল, "কেমন দেখতে রে পিওনটা?"

মীরা বলল, "তা অত করে কে দেখেছে! পিওন ত পিওন, সব পিওনের মত চেহারা। কিন্তু ব্যাপারটা কি শুনি শঙ্করদা?"

শঙ্কর আবার ভাল করে খেতে আরম্ভ করল, বলল, "বিশেষ কিছুই নয়।"

মীরা বলল, "সেই ভাল। আমি ভাবলাম, তুমি যেন

শার্লক হোমস্‌এর মত হয়ে উঠলে! কথাবার্ত্তা ঠিক্ সেই রকমই বলছিলে।”

শঙ্কর ওদিকে ভাবতে সুরু করে দিয়েছে কি যেন!

ওর কাণে মীরার কোন কথা প্রবেশ করল কিনা কে জানে!

এর পর শঙ্করের দুটো দিন কাটল ব্রজেনবাবুর লেখা রিপোর্ট ভাল করে বিশ্লেষণ করে পড়তে-পড়তে। কিভাবে অগ্রসর হবে, তাও ভেবে নিয়েছে এর মধ্যে। আজই বেরুতে হবে রাতে। খেয়ে-দেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল শঙ্কর। রাত দশটা বাজতে আর একটু বাকি আছে। ওর সহকারী নারায়ণ আসবে তখন। শঙ্কর তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। নারায়ণ বেশ এগুচ্ছে। রোজই সে শঙ্করের সাথে দেখা করে উপদেশ নিয়ে যাচ্ছে।

মীরা এসে বলল, “ভাবছ কি তুমি এত? বল ত!”

শঙ্কর সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, “বিশেষ কিছু নয়; কিন্তু বেরুতে হবে একবার। কালো গরম কোটটা বের করে দাও, আর দুটো রিভলভার দিও। টোটা দিও বেশী করে, টর্চ্চটাও দিও। ছোট সুটকেশটার মধ্যেই সব সাজিয়ে দিও। জানই ত সব, দরকার হলে যেন সাজ বদলাতে পারি, বুঝলে?”

মীরা বলল, “তার মানে? রাত দুপুরে কোথায় চললে?”

শঙ্করের রোজকার ইতিবৃত্ত মীরার জানা চাই-ই, এবং রোজ এসে শঙ্কর সব কথা না বললে দুঃখিতও হয়। কিন্তু

শঙ্করের আজ কোন কথা বলার মত অবসর নেই—মনের অবস্থাও নেই।

হেসে বলল, "যাব একটু বাইরে, এসে সব বলব। লক্ষ্মীটি, এবারে যা-যা বললাম, তাই কর শীগগির। এক্ষুণি নারায়ণবাবু আসবেন। হাওড়া ষ্টেশন হতেই সোজা আসবে এখানে, তখন আর সময় পাব না।"

কালো কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিল শঙ্কর। আরো কিছু কিছু সাজ-গোছ করে নিল সময়োপযোগী, যেন শঙ্কর বলে কেউ না চিনতে পারে।

দরজায় কে কড়া নাড়ছে! হ্যাঁ, নারায়ণই এসেছে।

নারায়ণকে ঘরে নিয়ে এল শঙ্কর। বললে, "পরে শুনব সব রাস্তায়। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ত?"

নারায়ণ বললে, "হয়েছে। কিন্তু এ-দুদিনের খবর মন্দ নয়। শীতলা ভৈরবীর আগের আস্তানাটা খুঁজে পেয়েছি।"

নারায়ণ বলতে লাগল, "তোমার প্রণালীতে চলেই পেয়েছি। আমার ওতে কোন বাহাদুরি নেই। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য খবর তোমায় দিতে পারি। শীতলা ভৈরবী…"

শঙ্কর মুখ তুলে তাকাল একবার। বলল, "হ্যাঁ, শীতলা ভৈরবী। কিন্তু শোন, এখন তার চেয়ে আরো জরুরী প্রয়োজনে আমাকে একবার বেরুতে হবে। তোমাকে বলেছিলাম ট্রেণের কথা—আশা করি ঠিক করে এসেছ?"

নারায়ণ বলল, "হ্যাঁ, করেছি।"

শঙ্কর বলল, "প্যাসেঞ্জার-ট্রেণে যাওয়া সঙ্গত হবে না,

একথা তোমাকে আগেই বলেছিলাম। ভাল কথা, তোমাকে বলা হয়নি, এই একটা পত্র এসেছে। এই দেখ পত্রটা।

নরমুণ্ড-অঙ্কিত সেই পত্রটা বের করে দেখাল নারায়ণকে। পত্রটা পড়ে নারায়ণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সে বলল,"এযে দেখছি আমাদের পিছু ধাওয়া করতে চাচ্ছে! প্যাসেঞ্জার-ট্রেণে যাওয়া-আসা আর কিছুতেই হতে পারে না। আমি ব্যবস্থাও করেছি সে-মত। সাড়ে এগারোটায় একটা ইঞ্জিন যাবে বর্দ্ধমানে, তুমি তাতেই যেতে পার। আমি ব্যবস্থা করে এসেছি ষ্টেশন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সাথে। কোথাও থামে না, খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে যাবে।"

শঙ্কর তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সব ঠিক করে একটা ট্যাক্সি ডাকল।

সে বলল, "কাল সকালেই আমি ফিরছি সেই ট্রেণে। আর শোন, যদি শেষ রাতের দিকে চারটার মধ্যে আমার নিকট হতে কোন তার বা ফোন না পাও, তা হলে যেমন করেই হোক, ট্রেণের সমস্ত যাত্রী এবং যাত্রীদের অভ্যর্থনা করার জন্য ষ্টেশনে যারা উপস্থিত থাকবে, তাদের সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। তোমাকে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু নিয়ে যাওয়া আজ উচিত হবে না। তুমি দেখ এদিক্‌কার ব্যাপার। আর হ্যাঁ, শীতলা ভৈরবীর কথা কি বলছিলে?"

নারায়ণ বলল, "সে ভারী আশ্চর্য্য ঘটনা। ইন্‌স্পেক্টার অব প্রিজন্‌স্ সব পুরানো ফাইল দেখালেন তন্ন-তন্ন করে। শীতলা ভৈরবী মারা যায় জেলের মধ্যেই, তাকে কবর দেওয়া

হয় জেলের বাইরেকার সব্জী-বাগানে। কবর দেওয়ার সময় জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত ছিলেন।"

—"তারপর ?"

—"তারপর দুদিন পরে দেখা যায় যে, কবরটা খানিকটা এলো-মেলো হয়ে আছে। মনে হচ্ছে খুঁড়েছে যেন ! জেলারের সন্দেহ হয়। সে পরের দিন কবর খুঁড়ে দেখে, কাপড় দেওয়া ঢাকা মৃতদেহ ঠিকই আছে।

—"কাপড় দেওয়া ঢাকা মৃতদেহ পড়ে আছে দেখা গেল ?"

—"হ্যাঁ, তাই দেখা গেল।"

শঙ্কর বলল, "কাপড় সরিয়ে ওরা দেখেছিল মৃতদেহ আছে কিনা ?"

নারায়ণ বলল, "না, তা দেখেনি। কারণ, জেলারের আর কোন সন্দেহ হয়নি। তাছাড়া যারা কবর খুঁড়েছিল তারা তাতে আপত্তিও করে !"

—"কেন ?"

—"আপত্তি করে এজন্য যে, একবার কবরস্থ করা মৃতদেহকে আবার খোলা নাকি অত্যন্ত দূষণীয়। কবর দেওয়ার পরই নাকি তার আত্মা জীন্ হয়ে গিয়ে তার উপর পাহারা দেয়। যারা পুনরায় তার মৃতদেহ দেখবে, তাদের উপর নাকি অপদেবতার ভর হয়।"

শঙ্কর বলল, "চুলোয় যাক্ সে-সব কথা, পরে এসে শুনব। আর দেরী নেই—এই ট্যাক্সি !"

একটা ট্যাক্সি ডেকে শঙ্কর তার নূতন পোষাকে চলল নূতন অভিযানে।

নারায়ণ রইল এদিক্‌কার পাহারায়।

যাবার সময় পুনরায় শঙ্কর বলে গেল, "মনে থাকে যেন তোমার উপর যে-সব ভার দিলাম সে-সব কথা। আমি অবশ্য সকালেই ফিরব—যদি ফিরতে না পারি, তাহলে সব যাত্রীদের ও তাদের অভ্যর্থনাকারীদের প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আর আমার বাড়িতে পাহারার ব্যবস্থাও রেখ একটু।"

পাঁচ

ষ্টেশনে এসে ষ্টেশন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সাথে দেখা করল শঙ্কর। পুলিশের ডিটেকটিভ-কার্ড দেখিয়ে কি-কি সাহায্য চাইল।

সাহেব বললেন, "আপনি গার্ডকে ফোন করতে বলছেন? বেশ, কিন্তু কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

শঙ্কর হেসে বলল, "আপাততঃ আপনাকে বলার অনুমতি নেই। পরে নিশ্চয়ই আপনাকে জানাব।"

সাহেব পীড়াপীড়ি করলেন না। বললেন, "বেশ, আপনার যাতে সুবিধা হয়, সে ব্যবস্থা করব। যেখানে-যেখানে বললেন, সে-সব জায়গায় আমি ফোন করে বলে দোব আপনাকে সাহায্য করতে।"

অভিবাদন জানিয়ে শঙ্কর ইঞ্জিনে চাপল এসে।

পথে কোন কষ্ট হলো না শঙ্করের। কোথায় একটা ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে—তাই একটা রিজার্ভ-ইঞ্জিন যাচ্ছে সেখানে বর্দ্ধমান হয়ে। ইঞ্জিনে করেই এসেছে শঙ্কর—ইঞ্জিনের সাথে কোন গাড়ী দেয়নি। ভালই হয়েছে শঙ্করের, কারো সন্দেহ করার কোন উপায়ই নেই।

ট্রেণ সেই যে ছেড়েছে কলকাতা হতে, আর এসে থামল বর্দ্ধমানে কয়লা নিতে; জলও বদলাবে।

শঙ্কর নেমে পড়ল। হাতে তার সময় নেই একদম,

হাতঘড়িটা দেখে নিল একবার। মাত্র আটাশ মিনিট বাকি সেই নটোরিয়াস্ ট্রেণটা ছাড়বার। এর মধ্যে একবার ট্রেণের গার্ড আর ড্রাইভারের সাথে আলাপ করে নিতে হবে। অবশ্যি পূর্ব্ব-ব্যবস্থামত হাওড়া হতে নিশ্চয়ই ষ্টেশন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এদের শঙ্করের কথা জানিয়ে ফোন করেছেন। তবু সামনা-সামনি আলাপ-পরিচয় করে নেওয়া দরকার।

দেরী করলে চলবে না। আর কিছু পরেই ট্রেণ, অথচ ষ্টেশনে লোকজন নিতান্তই কম। প্রায় সব বগিগুলিই খালি—যাত্রী নেই সেগুলোতে। সব যাত্রী ভীড় করেছে একটিমাত্র গাড়ীতে। বাঙ্কের উপর শুয়ে যাচ্ছে, আপাদমস্তক চাদর দিয়ে একজন লোক, বেশ নির্ব্বিবাদেই চলছে তারা।

নরমুণ্ডর বিভীষিকায় সবাই নিস্তেজ এবং অবসন্ন। একান্ত দরকার না হলে আর কেউ ট্রেণে চাপে না।

যাক্ সে-সব কথা, এখন হাতে আর তার সময় নেই। একটা টিকিট করতে হবে হাওড়া ষ্টেশনের। অবশ্য পুলিশের কার্ড তার কাছে রয়েছে, এ-কার্ড দেখিয়ে সে ভারতবর্ষের যেখানে খুশি যেতে পারে। কিন্তু নানা কারণে সে কার্ড ব্যবহার না করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছে।

টিকিট-ঘরের কাছে এসে টিকিট চাইল একখানা।

ভীড় ছিল না কিছুই। টিকিট দিতে-দিতে বুকিং-ক্লার্ক একবার দয়ালু দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে। ভাবটা—হায়রে, শেষটায় প্রাণ হারাবে!

সময় হয়ে এসেছে। একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সমস্ত প্লাটফর্ম্মটা

ভাল করে তাকিয়ে দেখল শঙ্কর। এতবড় প্লাটফর্ম্ম—লোক নেই একটিও বলতে গেলে! চায়ের দোকানটাতে মিট্‌মিট্‌ করে একটা আলো জ্বলছে। কে একজন কালো চেহারার বেঁটে মতন লোক বসে চা খাচ্ছে!

এক কাপ চা খেয়ে নিলেও মন্দ হত না।

শঙ্কর এগিয়ে গেল চায়ের দোকানে। আগের লোকটির চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। শঙ্করের দিকে একবার তাকিয়ে সে চলে গেল। বেশ মজবুত চেহারার লোকটি। গাণ্ডাগুণ্ডা চেহারা, স্টেশনের খালাসী বোধহয়। খালাসীর পোষাক পরা।

চা খেয়ে, চায়ের দাম মিটিয়ে, তাড়াতাড়ি করে সে গিয়ে দেখা করল গার্ডের সাথে। দূরে তারই দিকে কে আসছে, দেখে ভয়েই সে বেচারা আধমরা!

শঙ্কর গিয়ে তাকে তার কার্ড দেখালে, সে বেচারা তবে শান্ত হলো। কিছু কথাবার্ত্তার পর দুজনে মিলে গিয়ে দেখা করল ড্রাইভারের সাথে। তবু যাহোক, ড্রাইভার একা নয়, আর ড্রাইভার বেচারা সাহসীও বেশ।

চায়ের দোকানে দেখা খালাসীটাও এতক্ষণে এসেছে, বেঁটে সেই কালো মতন চেহারার লোকটা—সে ত এ-ট্রেণেরই একজন খালাসী।

লোকটা একবার শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বয়লারে কয়লা মারতে আরম্ভ করল।

গার্ডের বয়স এই মাঝামাঝি—নিরীহ ভদ্রলোক। বলল,

"বুঝছেন কিনা, এ-লাইনে আজ অনেককাল ট্রেণ চালাচ্ছি, কিন্তু এমন অসম্ভব কাণ্ড কোনদিন দেখিনি। এদিক্‌কার গ্রামগুলির নাম জানেন ত? বুঝলেন কিনা, ইন্দ্রখালি পর্য্যন্ত কোন ভয় নেই। বাদামতলী, মোহনগড়, তারপরই ইন্দ্রখালি। ইন্দ্র-খালির পরেই বুঝলেন কিনা, ভূতুড়ে ডাঙ্গা—"

—"ভূতুড়ে ডাঙ্গা?"

—"আজ্ঞে, বুঝলেন কিনা, ভূতুড়ে ডাঙ্গা! ব্যস্‌, বুঝলেন কিনা, এর পর যে কি হয়, মা গঙ্গাই জানেন! ভূতুড়ে ডাঙ্গার পর, বুঝলেন কিনা, সম্মোহনগঞ্জ আর ঘাড়-মটকার মধ্য দিয়ে যখন ট্রেণ চলতে থাকে, কিন্তু বুঝলেন কিনা···আরে সময় যে হয়ে গেল, তা চলুন আমার গার্ডের রুমে। দুজনে গল্প করতে-করতে যাওয়া যাবে।"

শঙ্কর হেসে বলল, "আপাততঃ থাক্‌। আমি অন্য কোন কম্পার্টমেণ্টেই উঠি, দরকার হলেই দেখা করব। কিন্তু খুব সাবধানে গাড়ী চালাবেন, আর কোন অবস্থায়ই ঝিমিয়ে পড়বেন না যেন।"

গার্ড ভেবেছিল তবু একজন পুলিশের লোক সাথী পাওয়া গেল; কিন্তু যখন শোনা গেল যে শঙ্কর সাথে থাকবে না, তখন একটু দমে গেল বেচারা।

শঙ্কর গার্ডকে নমস্কার করে ফিরল। ধীরে-ধীরে এসে দাঁড়াল যাত্রী বোঝাই সেই কম্পার্টমেণ্টের কাছে।

লক্ষ্য করে দেখল, কেউ তাকিয়ে দেখছে কিনা!

না, কেউ কোথাও নেই। ইঞ্জিন হতে সেই খালাসীটা

মুখ বাড়িয়ে রয়েছে, বোধহয় গার্ডের সবুজ আলো দেখবার জন্যে। সবুজ আলো দেখালেই গাড়ী চলতে সুরু করবে।

ঢং-ঢং করে গাড়ী-ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল।

শঙ্কর এবারে গাড়ীতে উঠবে। উঠতে যাচ্ছে, মনে হলো, কে যেন অতি ধীরে ডাকল, 'শঙ্কর !'

গাড়ী চলতে সুরু করেছে। চলন্ত গাড়ীর হাতল ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখল বাইরে,—না, কেউ নয় ! মনের ভুল। অথবা গাড়ী চলার শব্দকেই সে 'শঙ্কর' বলে ভেবে নিয়েছে মনে-মনে !

উঠেছে সে সেই একটিমাত্র যাত্রী-বোঝাই গাড়ীখানায়। সবাই হকচকিয়ে গেল একবার।

সবাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করছে তারা ওর দিকে চেয়ে-চেয়ে। একে অন্যে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন !

একটি বেশ জোয়ান গোছের লোক ছিল গাড়ীতে। সে উঠে এসে গাড়ীর দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল। দরজায় যার যা কিছু মালপত্র ছিল, সব জড়ো করে রাখা হলো ভবিষ্যতের কোন বিপদের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্যে।

বোঝা গেল, নিজেরা পরামর্শ করে ইতিপূর্ব্বে এরা এ-রকম ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ভালই করেছে, সাবধানের মার নেই।

ট্রেণ চলছে।

সবুজ ছায়াভরা বাংলাদেশের গাছপালার মধ্য দিয়ে, গ্রাম

ও বনের মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে ট্রেণ চলছে। আকাশে অল্প-অল্প জোছনা উঠেছে। আর ক'দিন পরেই অমাবস্যা।

প্রকৃতির শোভা শঙ্করের ভাল লাগে, কিন্তু সেদিকে আজ ওর মন নেই। ব্রজেন্দ্রবাবুর তদারকের সব রিপোর্ট সে আগাগোড়া পড়েছে। বিশেষ কিছুই বুঝতে পারেনি। কেবল এটুকু বুঝতে পেরেছে যে ট্রেণ চলতে-চলতে যখন ভূতুড়ে ডাঙ্গা পার হয়ে যায়, তার পর হতেই কেমন একটা থম্‌থমে ভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর আর কারো কিছু মনে থাকে না!

একথা সে ইতিপূর্ব্বেই শুনেছে।

ওদিকে দেখতে-দেখতে ট্রেণ বাদামতলী, মোহনগড় প্রভৃতি গ্রামগুলি পেরিয়ে যায়। এক-একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামে— দু-একজনও নামে উঠে কিনা সন্দেহ।

আবার গাড়ী চলতে সুরু করে।

' যতই গাড়ী এগুচ্ছে, ততই লোকজনের মুখের হাসি বদলে যাচ্ছে। প্রত্যেকের মুখের চেহারা হয়ে উঠছে অমানুষিক গম্ভীর এবং আর্ত্তনাদের ছায়া নেমে আসছে তাদের সমস্ত অবয়বে।

নেই-নেই করেও ট্রেণে প্রায় বাইশজন যাত্রী। বৃদ্ধের সংখ্যাই বেশী। বাঙ্কের উপর যে লোকটি শুয়ে আছে, সে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে এখনও। তার মুখ দেখা গেল না এ-পর্য্যন্ত। যাক্, তবু প্রাণভয়ে ভীত নয় এমন অন্ততঃ একটি লোক এ-গাড়ীতেই রয়েছে!

এরপর এল ইন্দ্রখালি।

বেশ বড়সড় স্টেশন এটা। একটা ছোট্ট লাইন এখান হতে চলে গেছে রূপতলীর দিকে। চুলোয় যাক রূপতলী! ইন্দ্রখালিতে ট্রেণ থামে মিনিট-দশেক। চায়ের দোকান একটা অবশ্য আছে এখানে, কিন্তু কোথায় চায়ের ভেণ্ডার?

কয়েকটা মাল ছিল গার্ডের সাথে লাগেজ-ভ্যানে। বোধহয় ইন্দ্রখালির স্টেশন-মাষ্টারই হবে, সেই লোকটি আর এ-গাড়ীর গার্ড দুজনে মিলে সে মালগুলি নামালেন প্লাটফর্ম্মে। ড্রাইভারকে বোধহয় কিছু উপদেশও দেবার ছিল গার্ডের। তার লালবাতি নিয়ে সে চলল ইঞ্জিনের দিকে।

এরপরই ভূতুড়ে ডাঙ্গা।

শঙ্করের কাছেও চাবি ছিল, সে দরজার কাছে মালপত্র নামিয়ে চাবি খুলে নামল প্লাটফর্ম্মে। গার্ড লণ্ঠনটা দোলাতে-দোলাতে বোধহয় ভয়েই একটা গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছিল! দূর হতে কালো পোষাক-পরা শঙ্করকে দেখে চিনতে পারেনি। হঠাৎ দাঁড়িয়েই সে কাঁপতে সুরু করে দিয়েছে। আজ বুঝি প্লাটফর্ম্মের উপরই তার শেষ হয়ে যায় রে! হায়রে, আত্মীয়-স্বজন কেউ দেখবে না!

তবু চিঁ-চিঁ করে বলল, "বুঝলেন কিনা! কে? হু কাম্‌স্‌ দেয়ার (Who comes there)?"

শঙ্কর হেসে চীৎকার করে বলল, "ফ্রেণ্ড, ভয় নেই আমি!"

গার্ড চোখ মিট-মিট করে তাকিয়ে বলল, "আপনি?

বুঝলেন কিনা এমন করে ভয় দেখাতে হয় মানুষকে? কি ভয়ই যে পেয়েছিলাম—বুঝলেন কিনা!"

শঙ্কর হেসে বলল, "বুঝলাম। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না ত!"

গার্ড বলল, "পাননি, ভাগ্য ভাল। কিন্তু পাবেন না বলে যদি ঠিক করে থাকেন, তাহলে ভাল করেননি মশাই!

বুঝলেন কিনা, এর পরই ভূতুড়ে ডাঙ্গা। ভূতুড়ে ডাঙ্গা পেরিয়ে পরের জায়গাটার নাম সম্মোহনগঞ্জ, তারপরই বুঝলেন কিনা ঘাড়মটকা।"

শঙ্কর বলল, "নামটাও বেশ বেড়ে—ঘাড়মটকা!"

গার্ড বলল, "বুঝলেন কিনা, ঠিক বলেছেন—ঠিকই ঘাড় মটকায়। এ জায়গাগুলিই বুঝলেন কিনা হচ্ছে বিপদজনক। আর এখনও কিছু টের পেলেন না, বুঝলেন কিনা—কিন্তু টের পেতেও বেশী সময় লাগবে না।"

দুজনে কথা বলতে-বলতে ইঞ্জিনের কাছে এসে পড়ল।

শঙ্কর বলল, "ইঞ্জিনে মোট লোক ক'জন?"

গার্ড বলল, "তিনজন,—একজন ড্রাইভার, দুজন খালাসী, রহমৎ আর কালু। ড্রাইভার অনেক দিনের পুরাণো। খালাসীর একজনও প্রায় বছর পনেরোর। একজন শুধু নূতন,—নাম তার কালু।

ইঞ্জিন হতে কে যেন গভীর দৃষ্টিতে কয়লা ভাঙ্গতে-ভাঙ্গতে শঙ্কর আর গার্ডের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে!

শঙ্কর তাকাল একবার। ও, একে ত সে আগেই দেখেছে!

ভাল করে তাকিয়ে দেখল এবারে—কালো, বেঁটে মতন চেহারা। বেশ গাট্টা-গোট্টা মজবুত চেহারা। কপালের কাছে কিসের একটা দাগ।

শঙ্করও তাকাল সেই খালাসীটার দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে। চোখাচোখি হলো দুজনে, লোকটা যেন হাসল একটু। নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগল।

ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে যা-যা উপদেশ দেবার দিয়ে শঙ্কর আর গার্ড ফিরল।

ফিরতে-ফিরতে কথা চলছে দুজনে।

শঙ্কর বলল, "আচ্ছা, ইঞ্জিনে যারা কাজ করে, তাদেরও কি কোন খেয়াল থাকে না?

গার্ড বলল, "আছেন কোন্ তালে আর! বুঝলেন কিনা, কে যে গাড়ী চালায়, তাই তাদের জ্ঞান থাকে না! দেখবেন মজা একটু পরে।

শঙ্কর বলল, "আচ্ছা, আমি যে পুলিশের লোক, তা বলেছেন কাউকে?"

গার্ড বলল, "হাসালেন মশাই! বুঝলেন কিনা, ফোন করে বড়সাহেব, বুঝলেন কিনা, স্বয়ং বড়সাহেব জানিয়েছেন যে, এ-ব্যাপারে তদারকের জন্য আপনি আসছেন। তাঁকে যেন সর্ব্বরকমে সাহায্য করা হয়। বুঝলেন কিনা, আদেশ যখন করেছেন তখন পালন করতেই হবে ওদের! কাজেই বুঝলেন কিনা, ইঞ্জিনের খালাসী আর ড্রাইভারকেও বলেছি সেকথা।"

গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এল।

কে যেন দৌড়তে-দৌড়তে আসছে! কালো বেঁটে মতন চেহারা, বেশ গাট্টা-গোট্টা মজবুত চেহারার সেই খালাসীটাই। হাতে তার একটা খাতা—ইঞ্জিনের খালাসী।

গার্ড বলল, "কিরে, কি? তুই কেন, তুই কেন রে কালু?"

খালাসী বলল, "খাতা সই করে আসেননি।"

গার্ড বলল, "আহাম্মক কোথাকার, পরের ষ্টেশনে দিলেই পারতিস্! যা—দৌড়ো শীগগির! দেখো কাণ্ড—ওদিকে ঘণ্টা দিয়েছে! বুঝলেন কিনা শঙ্করবাবু—বুড়ো হচ্ছি না ভুলো মন হয়ে যাচ্ছে! তা বুঝলেন কিনা···ওকি, আপনি এখন নামছেন কেন? বাঃ, আমার সাথেই থাকবেন বললেন···নামছেন কেন?"

শঙ্কর বলল, "ছেড়ে দেবেন না গাড়ী। লেট হলে কৈফিয়ৎ আমি দোব। কিন্তু আমার গতিবিধি যতদূর সম্ভব গোপন রাখতে চাই বলে অন্য গাড়ীতে উঠছি।"

ছয়

শঙ্কর নেমে পড়ল এবং তার পূর্ব্বের গাড়ীতে এসে উঠল। পোষাকটা তার কালো, তাতে গোঁফ লাগান। শঙ্করকে দেখলে তাই অন্যরকম মনে হয়। লোকগুলি ওর দিকে ভীত-চকিত চোখে তাকিয়ে রইল।

শঙ্কর বুঝতে পারছে, এ-ঘরের প্রতিটি লোক অতি সন্তর্পণে ওকে পাহারা দিচ্ছে।

মনে-মনে শঙ্কর হাসল।

গাড়ী ওদিকে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে এইমাত্র। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শঙ্কর লক্ষ্য করতে লাগল চারি-দিকে। হঠাৎ মিষ্টিগলায় কে যেন অতি ধীরে তাকে ডাকল, "শঙ্কর!"

সুরটা যেন শঙ্করের চেনা-চেনা! দুঃখের রাতে চকিত দৃষ্টিতে সে গাড়ীর ভিতর তাকাল।

না, এবারে সে অতি স্পষ্টই শুনতে পেয়েছে। কিছুতেই এ তার মনের ভ্রম নয়।

মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে সমস্ত গাড়ীর প্রতিটি লোকের উপর সে বুলিয়ে নিল তার আপাদমস্তক গভীর দৃষ্টি। লোকগুলি ভীত-চকিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাঙ্কের উপর শায়িত লোকটি এখনও পরম নির্ব্বিকার হয়ে শুয়ে আছে। একবার

ওপাশে ফিরে শুলো। মুখ দেখা যাচ্ছে না তার। দরজার কাছে বাঙ্কের উপরই শুয়ে আছে লোকটি।

কি করবে শঙ্কর ভেবে পেল না।

গাড়ী ছুটছে।

গভীর নিশীথিনীর বুক কাঁপিয়ে গাড়ী ছুটে চলছে অশ্রান্ত গতিতে। আকাশে সহস্র-সহস্র তারার অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা। দুপাশে ক্লান্ত অবসন্ন মাঠের উপর দিয়ে গাড়ী ছুটে চলছে।

বাতাসে মৃদু-মধুর অপূর্ব্ব সুর।

ধরিত্রী যেন নেচে উঠছে—পৃথিবীর সব আলো যেন জ্বলে উঠবে কোন্ মহা উৎসবের জন্যে !

কোথা হতে যেন পরম রমণীয় কোন রহস্যময়ীর মৃদুল চরণ-ধ্বনি নূপুর নিক্কণে বেজে উঠছে !

কে যেন বলছে, "আনন্দ কর, আনন্দ কর !"

শঙ্কর বুঝতে পারছে যে সম্মুখে তাদের সেই ভয়াবহ মুহূর্ত্ত ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। এর পর ধীরে-ধীরে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর চলবে মারণাস্ত্রের দিগ্‌বিজয়। আরম্ভ হবে শয়তানের খেলা—তাদের পরমোৎসব।

গাড়ীর লোকগুলির মধ্যেও যেন এসেছে মাদকতা! সাপের মুখের সম্মুখে পড়ে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণীর চোখে যে কাতরতা জাগে, তাদের দৃষ্টিতেও সেই কাতরতা !

দুর্ভাগ্য শঙ্করের ! ওকেই তারা ধরে নিয়েছে তাদের মৃত্যুদূত হিসাবে।

হায়রে ! কি করে সে ওদের বোঝাবে যে, সে ওদের শত্রু নয় ?

লোকগুলির কাতর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ ফুটে বেরুচ্ছে প্রতিহিংসার আক্রোশ। সেই যে জোয়ানগোছের একটি লোক ইতিপূর্ব্বে এ-কম্পার্টমেণ্টের দরজায় চাবি লাগিয়েছিল, সে অন্য যাত্রীদের চোখের কি ইঙ্গিত করল। দেখতে-দেখতে দশ-পনরজন যাত্রী ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্করের দিকে।

শঙ্কর মনে-মনে হাসল। দ্রুতগতিতে খানিকটা পিছনে হটে গিয়ে ঠিক দরজার কাছে পিঠ রেখে দাঁড়াল। সে চোখের নিমেষে পকেট হতে গুলি-ভরা দুটো রিভলভারই বের করে দাঁড়াল দুই হাতে।

সাপের মাথায় যেন ধূলো ছড়িয়ে দিয়েছে কে !

না, মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাবার উপায় নেই আজ—সবাই ভাবতে লাগল, মৃত্যু নিশ্চিত এবারে।

শঙ্কর সোজা হয়ে দাঁড়াল ; বলল, “আমি বুঝতে পারছি তোমরা সবাই আমাকেই মনে-মনে সন্দেহ করেছ আমিই সেই নরমুণ্ডের নায়ক। তোমরা ভুল করেছ।”

চীৎকার করে শঙ্কর বলল, “তোমরা ভুল করেছ, কিন্তু এ-ট্রেণেই কোথাও সেই শয়তান নিশ্চয়ই রয়েছে। আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। আমি তোমাদের বন্ধু—তোমাদের সাহায্য পেলে আমি সেই শয়তানকে ধরতে পারি।”

কে যেন কোথায় হেসে উঠল খিল্-খিল্ করে !

না-না-না। শুধু একজন নয়, অনেকে হাসছে! কি সুন্দর হাসি! কি মিষ্টি হাসি!

সে হাসিতে যেন স্বর্গের সমস্ত রস-মাধুর্য্য রূপায়িত হয়ে উঠেছে! যেন বসন্ত নেমে এসেছে নব-যৌবন নিয়ে!

হাসতে ইচ্ছা করছে শঙ্করের। গান গাইতে ইচ্ছা করছে শঙ্করের।

ওকি! যাত্রীরা সবাই যে নৃত্য সুরু করে দিয়েছে! একে অন্যে ঢলে পড়ছে একে অন্যের গায়। কোথায় গেল তাদের চোখ-মুখের সেই গাঢ় দীর্ঘশ্বাসের চিহ্ন—কোথায়ই বা গেল তাদের ভীতিপ্রদ ভাব?

ট্রেণ তেমনি ছুটে চলেছে।

গানের সুর ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। কে যেন বলছে, "ঘুম, ঘুম, ঘুম! আনন্দ কর, আনন্দ কর!"

সত্যিই ত, শঙ্করেরও ঘুম পাচ্ছে! দেহে-মনে এসেছে তার উদ্দাম কল-কোলাহল।

না-না, হতে পারে না, এ হতে পারে না। কিছুতেই সে আত্ম-সমর্পণ করতে পারে না শয়তানের হাতে। কিন্তু কি করবে সে? যাত্রীদের অধিকাংশেরই চোখে জড়তা নেমে এসেছে।

তারা হাসছে—তারা গান গাচ্ছে—তারা নৃত্য করছে। তারা লাফাতে সুরু করে দিয়েছে!

আর সমস্ত বাতাসের গায় কে যেন বলছে—"আনন্দ কর, আনন্দ কর! ঘুম, ঘুম! ঘুমাও সবাই, ঘুমাও,—গাঢ় ঘুমে

ঘুমিয়ে পড়। সম্মুখে তোমাদের স্বর্গ-সিংহাসন।...ঘুম, ঘুম, ঘুমাও—গভীর ঘুমে ঘুমাও!"

আশ্চর্য্য! বাঙ্কের উপরের লোকটিকে দেখা যাচ্ছে না ত! কোথায় গেল সে?

একটা ছায়ামূর্ত্তি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে সমস্ত ঘরময়! সবাইকে সম্মোহন করল নাকি? না অন্ততঃ সে শঙ্করকে সম্মোহন করতে পারেনি, তাই তার ছায়ামূর্ত্তি দেখা যায়!

দেখা যাচ্ছে না কাউকে! তবু শঙ্কর বুঝতে পারছে—মূর্ত্তিহীন ছায়ামূর্ত্তিতে এ-ঘরেই আরেকজনও আছে, যাকে দেখা যাচ্ছে না ভাল করে।

একি তার কল্পনা? সেকি নিজের ছায়া দেখেই চমকে উঠছে নাকি? কিন্তু ধীরে-ধীরে সেও যেন সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছে!

খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল যেন কানের কাছে কে!

না-না, তা হয় না—তার উপর নির্ভর করছে সমস্ত জাতির মান—পুলিশ-বিভাগের আত্ম-পরিচয়।

দুহাতে রিভলভার দুটো সোজা করে উঁচিয়ে ধরল শঙ্কর।

চীৎকার করে বলল, "ছায়ামূর্ত্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছ—কে তুমি? সত্যি পরিচয় দাও তোমার। নতুবা এই মুহূর্ত্তে আমি গুলি করব। বল, শীগগির বল—নইলে কুকুরের মত গুলি করব—ওয়ান্—বল শীগগির—টু..."

ওকি ঘরের আলো নিভিয়ে দিল কে?

শঙ্কর সরে দাঁড়াল।

গাড়ীর মধ্যে দুপদাপ শব্দ হচ্ছে! কে যেন তাকে ধরবার জন্য ঠিক দরজার কাছ দিয়ে এগিয়ে গেল!

শঙ্কর সেই দিকেই লক্ষ্য করে রিভলভার চালালো পর-পর অনেকগুলো।

হো-হো করে অট্টহাসি ফিরে এল শুধু।

অন্ধকার কম্পার্টমেণ্ট। যাত্রীরা সবাই আনন্দ হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত।

তবু শঙ্কর অনুভব করে অস্পষ্ট এবং অশরীরী কোন এক আত্মা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে সমস্ত ঘরময়!

গাড়ী ছুটে চলেছে—তার সাথে ঘুমের যাদুগান! ডেকে-ডেকে বলছে, "ঘুমো, ঘুমো, ঘুমো…"

না! আর এক মুহূর্ত্ত এখানে অপেক্ষা করলেও সে অবসন্ন হয়ে পড়বে।

হাতড়িয়ে-হাতড়িয়ে একটা জানালার কাছে সে এসে পড়ল।

একটা গরম নিঃশ্বাসের সাথে কার শীতল স্পর্শ যেন এদিক-ওদিক কাকে হাতড়াচ্ছে! সে বুঝতে পারলো, আর এক সেকেণ্ড দেরী করলেও নিশ্চিত মৃত্যুকে তার আলিঙ্গন করতে হবে।

চোখ তার ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে নিজকে তখনো ভোলেনি। তার মনে আছে—সে শঙ্কর; সে এসেছে নরমুণ্ডর ব্যাপারে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে—এখানে এদের হাতে বন্দী হতে নয়।

জানালাটার কাছে সে এগিয়ে গেল। ঘুমের নেশায় মাথা তার ঝিম্-ঝিম্ করছে। ঘুম পাচ্ছে তার—ঘুম, গাঢ় ঘুম! অবশ হয়ে আসছে তার সর্ব্বাঙ্গ। হাসতে ইচ্ছা করছে। কোন অশরীরীর শীতল স্পর্শ যেন এগিয়ে আসছে তারই দিকে!

না, আর দেরী নয়!—শঙ্কর জানালা দিয়ে "জয় দুর্গা" বলে লাফিয়ে পড়ল চলন্ত ট্রেণ হতে।

সাত

জ্ঞান ফিরল শঙ্করের ভোরের দিকে। পূব দিক লাল হয়ে উঠছে। গাছে-গাছে পাখীর কূজন শোনা যায়।

হাত-পা অবশ। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। হাঁটু দিয়ে রক্ত চুইয়ে-চুইয়ে জমাট বেঁধে আছে। আর সে পড়ে আছে রেল-লাইনের পাশে।

একটু দূরেই একটা নদী দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট নদীটি—আপন মনে বয়ে যাচ্ছে।

শঙ্কর উঠতে চেষ্টা করল। বহু কষ্টে উঠে বসল।

হাঁটতে গিয়ে পা চলতে চায় না। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলল নদীর দিকে! নদীর পাড়ে এসে আঁজলা-আজলা জল পান করল প্রাণ ভরে! চোখে-মুখে দিল জলের ঝাপটা!

আঃ—বেশ লাগছে তার!

কয়েকটি কৃষক গরু নিয়ে চলছে ক্ষেতে। পিঠে তাদের লাঙ্গল।

শঙ্কর হাত দিয়ে ইসারা করে ডাকল তাদের।

একজন এগিয়ে এল। শঙ্কর বলল, "এটা কোন্ জায়গা হে?"

লোকটি বলল, "তুমি জান না বলছ, এলে কি করে এখানে তবে?"

শঙ্কর বলল, "ট্রেণ হতে পড়ে গেছি।"

লোকটি বলল, "দেখেনি কেউ ?"

—"না।"

লোকগুলি ওর কথায় কি মনে করল কে জানে! কি সব পরামর্শ করল। শঙ্করের রক্তাক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল বার-কয়েক।

এখান হতে খানিকটা দূরে জন-দুই লোক একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এ-দিকেই কি যেন দেখছে! তারা কাছে এলো না।

পরামর্শ শেষ করে আগের সেই কৃষকটি আবার এগিয়ে এল। এসেই জাপটে ধরল শঙ্করকে। অন্য সবাইও লাঙ্গল ফেলে এসেছে ধরতে।

শঙ্কর বলল, "ব্যাপার কি ? অমন করছ কেন ?"

লোকটি বলল, "জাননা বুঝি তুমি ? চাষা বলে বোকা পেয়েছ ? হাতে ওটা কি ? বলি হাত-বন্দুক এলো কোত্থেকে শুনি ? কাল সাহাদের গদিতে ডাকাতি হয়েছে—তুমি পালাতে পারনি। চল, থানায় চল। চেহারা ত দেখছি বেশ ভদ্রলোকের মত !"

শঙ্কর হেসে বলল, "সেই বেশ, থানায়ই চল। কিন্তু গরুর গাড়ী করে যদি নিয়ে যেতে পার, পাঁচ টাকা পাবে তোমরা। হাঁটতে পারছি না। এই ধর টাকা।"

শঙ্কর পাঁচ টাকার একখানা নোট ধরল তাদের সামনে।

কিছুক্ষণ পরামর্শের পর তারা একটা গরুর গাড়ী নিয়ে এল।

গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ী ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে

চলতে আরম্ভ করল। দুপাশের ধানের গাছ। কচি-কচি শীষ উঠেছে। ক্ষেতে কৃষকরা কাজ সুরু করে দিয়েছে। বহুদূর দিয়ে আগেকার দেখা সেই লোক দুটিও চলছে সাবধানে।

অনেকক্ষণ গরুর গাড়ী চলার পর, গাড়ী এসে থামল থানায়।

থানার বড় দারোগা তখন ঘুরে-ঘুরে একটা নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করছিলেন থানার উঠোনে।

হৈ-হৈ করে গরুর গাড়ী গিয়ে থামল সেখানে।

—"কি রে, ব্যাপার কি ?"

—"আজ্ঞে সাহাদের গদিতে ডাকাত পড়েছিল কাল রাতে। তারই দলের একটা ডাকাত পালাতে পারে নি, ধরে এনেছি।"

বড় দারোগা দাঁতন-করা থামিয়ে বললেন, "বলিস কিরে ? তোরা বলিস কি ? ধরেছিস ? কি করে ধরলি ? বলি ধরলি কি করে ? চল্, চল্, দেখি।"

দেখেই ত তাঁর চক্ষুঃস্থির !

—"আরে, আরে, আরে—তোরা করেছিস কি ? চাকরি আর রইল না ! হারামজাদারা, করেছিস কি ?···হায়···হায়··· হায়, চাকরি রইল না ! আসুন, আসুন···শঙ্করবাবু আসুন··· দোষ নেবেন না।"

শঙ্কর বলল, "হাঁটবার শক্তি নেই।"

বড় দারোগা বললেন, "মেরেছে বুঝি বেটারা ! হারামজাদারা, তোদের সবাইকে আমি হাজতে পুরব, ফাঁসিতে লটকাব এক-একটা করে। যত সব উল্লুক নচ্ছার ! ডাকাত

দুহাতে রিভলভার দুটো উঁচিয়ে ধরল শঙ্কর

[পৃঃ—৪৩

ধরনেওয়ালারা আমার রে—চাকরি আর রইল না! তারপর আপনিই বা ডাকাতির আসামী হয়ে এসেছেন কেন? ব্যাপার কি বলুন ত?”

লোকগুলি ভেবেছিল একটা কাজের মত কাজ করেছে। অস্ত্রধারী ডাকাত ধরে এনেছে যখন—মোটা পুরস্কার নিশ্চয়ই মিলবে। কিন্তু এযে দেখছি আচ্ছা বিপদ!

লোকগুলি ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শঙ্কর হাসতে-হাসতে বড় দারোগাকে বলল, “ধীরে-ধীরে সবই জানতে পারবেন। আপাততঃ এদের সবাইকে পাঁচ টাকা করে বকশিষ দিয়ে বিদায় করুন। ওদের কোন দোষ নেই। ওরা না থাকলে আমাকে এখানে আসতে কষ্ট পেতে হত।”

শঙ্করকে লক্ষ্য করে ইতিপূর্বে দুটি লোক দূরে-দূরে তাকে অনুসরণ করছিল! শঙ্করের তা দৃষ্টি এড়ায় নি। তাকিয়ে দেখল, লোক দুটি থানার বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেরা কি কথা বলাবলি করে চলে গেল!

কারা এরা? শঙ্কর ভাবতে লাগল, এরা কারা? এখানেও কেউ পিছু নিল নাকি? না ডাকাত দেখতে এসেছে গ্রামের লোক? হয়ত তাই!

বকশিষের কথায় বড় দারোগা এতক্ষণে কাজের সুরাহা পেয়ে বললেন, “তাই করছি। আপনি নামুন। লছমন, তেওয়ারী!”

লছমন এল, তেওয়ারী এল। বড় দারোগা তাদের সাহায্যে ধরাধরি করে শঙ্করকে নামালেন।

শঙ্কর হেসে বলল, "আমাকে যে একেবারে রোগী বানিয়ে ফেললেন! অত কাহিল হইনি এখনও।"

—"তাহোক, আয় তোরা। ওরে, তোদের বকশিষ নিয়ে যা। চার টাকা করেই পাবি। যাক তোরাই আমার মান বাঁচালি! আরে ইনি হলেন পুলিশের একজন খুব বড় দরের লোকরে! তাঁকেই ধরে এনেছিস!"

লোকগুলি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

চা খেতে-খেতে শঙ্কর সব কথা বলল। আর বড় দারোগা শুনলেন সে সব। তিনি চোখ ছানাবড়া করে বললেন, "বলেন কি? আচ্ছা বিপদে পড়েছিলেন ত!"

শঙ্কর একটু হাসল মাত্র।

দারোগা বললেন, "যাই আমি একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। আপনার খাবার-দাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

শঙ্কর হেসে বলল, "ধন্যবাদ! সে আর একদিন হবে। কিন্তু যেমন করেই হোক, আজকে আমাকে ফিরতে হবেই।'

দারোগা বললেন, "ক্ষেপেছেন আপনি! এই শরীরে যেতে দি—শেষে চাকরি নষ্ট হয়ে যাক। ভাবনা কি আপনার? নরমুণ্ড ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না! আর বড়সাহেবকে আমি খবর পাঠাব এক্ষুণি। এখন বিশ্রাম করুন। আসছি আমি।"

আট

শঙ্কর খেয়ে-দেয়ে লাগাল এক ঘুম, আর ঘুম ভাঙল তার সন্ধ্যাবেলা। শরীরটা বেশ ঝরঝর করছে।

কে যেন কাছে বসে ডাকছে, "কি ঘুমুতেই তুই পারিস শঙ্কর! ওঠ্।"

চেনা এবং পরিচিত কণ্ঠ শুনে হকচকিয়ে উঠে বসল শঙ্কর। চোখ মেলে সামনেই দেখল, তারই সামনে বসে আছে বৈজ্ঞানিক অরবিন্দ!

শঙ্করও অবাক্! রীতিমত অবাক্! বলল, "তুই! তুই এখানে এলি কি করে অরবিন্দ? চিনিস নাকি কাউকে এখানকার?"

বড় দারোগা শঙ্করের কণ্ঠস্বর শুনে বললেন, "উঠেছেন নাকি শঙ্কর বাবু? এই ত বেশ উঠে বসেছেন! খবর্দ্দার মশাই, আর এ সব ভূতুড়ে ব্যাপারে আপনি হাত দেবেন না যেন! ও, একে চেনেন না বুঝি? আমাদের অরবিন্দ ডক্টর। ডক্টরেট অব সায়েন্স—লণ্ডন!

একটা মস্ত বড় জ্যান্ত প্রতিভা। সম্বন্ধটাও মধুর—শ্যালক বাবা-জীবন। তা বাবুর আসা হয় না বড় একটা এদিকে। এবারে কি মনে করে ভাই-ফোঁটা নিতে এসেছেন! এদিকে ভাই-ফোঁটা হয়ে গেছে কবে—সে খেয়াল নেই! তবু যে গরীব ভগ্নীপতিকে মনে করে এসেছেন, এই মহা ভাগ্য!"

নিজের মনেই হাসলেন দারোগা বাবু। দারোগা হলেও বেশ রসিক ও সরল মানুষ।

শঙ্কর বলল, "আপনার ভাগ্য কিনা জানিনে, আমার ভাগ্য ঠিকই। অরবিন্দ আমার বহুকালের বন্ধু। দুর্দ্দান্ত বন্ধুত্ব ছিল একদিন। অসময়ে দেখা হলো তবু।"

—"তাই নাকি? তবে আপনিও ত আমার সম্বন্ধীই হয়ে যাচ্ছেন! ভালই হলো।"

রসিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—তবু শঙ্কর হাসল!

দারোগা বললেন, "গল্প করুন বসে-বসে আপনারা। বড়-সাহেবকে আপনার কথা জানিয়েছি। আর ভাল কথা, নারায়ণ বাবুও এসেছেন! আপনি ঘুমোচ্ছেন দেখে বাজারের দিকে গেছেন একটু বেড়াতে। তা এলেন বলে!"

অরবিন্দ ভ্রূ কুঁচকিয়ে কি যেন ভাবছে!

যাক্, নারায়ণ তা হলে সংবাদ পেয়েছে!

দারোগা যেতে-যেতে বললেন, "আচ্ছা বিপদেই পড়েছি! আর এতসব সি-আই-ডি মোটা-মোটা মাইনেতে সব বসে আছেন—খেটে মরছি আমরা। এতদিনেও যদি এ খুন-খারাপীর হদিস হলো! আমার এলাকার লোকই রোজ রাতে শেষ হয় একটা-না-একটা। এখন বোঝ ঠেলা! তার এত্তালা নিতে-নিতেই মরি! বলি, আমরা পুলিশ এর কি করব? ......চাকরি আর থাকে না দেখছি!"

হন্তদন্ত হয়ে অফিস-ঘরে বসে তিনি কাজ করতে আরম্ভ করলেন।

শঙ্করের ইচ্ছা হলো জিজ্ঞাসা করে কাল রাতে কোন খুন হয়েছে কিনা ট্রেণে। কিন্তু একেই ত দারোগা বেচারী চাকরি যাবার ভয়েই অস্থির—তার ওপর ঝামেলা বাড়িয়ে আর কাজ নেই! এ সব এবং অন্যান্য কি কথা ভেবে শঙ্কর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

এবারে কথা আরম্ভ করেছে বৈজ্ঞানিক অরবিন্দ। বলল, "কিসের আলোচনা হচ্ছিল তোদের? ট্রেণে খুন! সে আবার কিরে?"

শঙ্কর বলল, "ট্রেণে খুন ঠিক নয়—নরমুণ্ডের কথা হচ্ছিল।"

অরবিন্দ বলল, "ও! আজকার কাগজেও দেখলাম, একজনের নরমুণ্ড পাওয়া গেছে। আশ্চর্য্য, তোরা কিছু করতে পারছিস না এতদিনেও! এখানকার পুলিশ কোন কাজেরই নয়—স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড হলে দেখতে পেতি, এতদিনে দলকে দল সব গ্রেপ্তার হয়ে যেতো।"

শঙ্কর হাসল। ঠিকই ত! উত্তর দেবার কিছুই নেই।

অরবিন্দ বলতে আরম্ভ করল, "আমি ত এখানে তোকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। প্রথমতঃ বিশ্বাসই করতে পারিনি তুই এসেছিস! তারপর দেখলাম, না তুইই শুয়ে! আছিস কেমন এখন? কি, হয়েছিল কি?"

শঙ্কর বলল, "মাথা আর মুণ্ডু! বলিস কেন সে সব কথা! আচ্ছা, তোকে একটা প্রশ্ন করি—সেদিন এড়িয়ে গেছিস, আজ বলতেই হবে।"

অরবিন্দ শঙ্করের পিঠ চাপড়ে বলল, "ভণিতা থাক্— কি প্রশ্ন তোর জিজ্ঞাসা কর।"

শঙ্কর চোখ বুজে কি ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "তুই আমার বন্ধু এবং বৈজ্ঞানিক। শুধু বৈজ্ঞানিকই বা বলি কেন—ইন্দ্রজাল সম্বন্ধেও তোর গভীর জ্ঞান! এ সব কারণেই তোকে জিজ্ঞাসা করছি—"

অরবিন্দ লাগাল ধমক : "আবার ভণিতা!"

শঙ্কর হাসল। হেসে বলল, "আমার বিদ্যে বিশেষ নেই— এ বিদ্যেতে এ সব প্রশ্ন করাও চলে না, তাই একটু ভণিতা করলাম। এখন প্রশ্ন হলো—আচ্ছা, তুই কি বিশ্বাস করিস যে ইচ্ছা করলে মানুষ অশরীরী হতে পারে? ইচ্ছা করলে কি মানুষ এমনভাবে চলাফেরা করতে পারে—যাতে তাকে কেউ চিনতে পারবে না?"

ধীরে-ধীরে অরবিন্দের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠছে। ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছে যেন!

হ্যাঁ, অরবিন্দের এ অভ্যাসটা স্বভাবগত হয়ে উঠেছে। গভীর কিছু চিন্তা করতেই ওর মুখও গভীর হয়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ অরবিন্দ কি ভাবল! একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শঙ্করের দিকে। তারপর হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল : "আচ্ছা প্রশ্ন করলি তুই! কিন্তু এর উত্তর জেনে কি লাভ হবে তোর?"

শঙ্কর এবারে আর ভণিতা করল না ; বলল, "উত্তর জেনে আমার ব্যক্তিগত লাভ কিছু নেই। কিন্তু আমি যে দায়িত্ব-

ভার গ্রহণ করেছি, তার কিছু সুরাহা হবে, এইটুকুই আমার লাভ।”

অরবিন্দ হাসল আবার। বলল, “বেশ, তোর উপকার যদি হয় শোন্। অবশ্য এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা আছে বলে স্বীকার করতে পারিনে; কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষ ইচ্ছা করলে যে অশরীরী না হতে পারে—তা নয়।”

একটু চুপ করে অরবিন্দ আবার বলতে আরম্ভ করলে, “আমাদের চোখে কতকগুলি রং—যাকে বলি colour, তা প্রতিফলিত হয় বলেই আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যদি এর ঠিক উল্টো কোন রং আবিষ্কার করা যায়, তাহলে সে ঠিকই থাকবে—কিন্তু তাকে কেউ চোখে দেখবে না এমন হওয়া অসম্ভব নয়। ইন্দ্রজিৎ একদিন মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করেছিল, মেঘের রং ঢাকা দিয়ে রেখেছিল তাকে।”

অরবিন্দ দস্তুরমত মেতে গেছে! সে বলে চলল, “তা ছাড়া পুরাকালে মুনি-ঋষিরা সময়ে-অসময়ে নানা রকম মূর্ত্তি ধারণ করতে পারতেন এ কিছু নূতন কথাও নয়। তার অর্থ কি? তাঁরা নিজেরা হতেন অশরীরী, নয় কি? অথচ এও হতে পারে, তাঁরা সম্মোহিত করতেন সবাইকে, আর সবাই তাঁদের দেখতো যে ভাবে ইচ্ছা করতেন মুনি-ঋষিরা।”

—“অর্থাৎ?”

—“অর্থাৎ মনে কর্ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসম্পন্ন জ্ঞানী মুনির যদি ইচ্ছা হত যে তিনি অন্য সবাইর নিকট তখনকার মত

রূপ বদলাবেন—তাহলে সত্যিই হয়তো নিজের রূপ বদলাতেন না—লোকেরা শুধু দেখতো মুনির বদলে অন্য কেউ।”

—“তাহলে তুই বলতে চাস”—শঙ্কর বলল, “তুই বলতে চাস আমি ঠিক আমার শরীর নিয়েই যদি ইচ্ছা করি যে লোকে আমাকে দেখবে না, তাহলে সত্যিই কেউ দেখবে না?”

অরবিন্দ বলল, “সেটা নির্ভর করে তোর জ্ঞানের ওপর। সম্মোহন কতখানি তুই অন্যকে করতে পারবি তার ওপর। আরও একটা দিক আছে অশরীরীর। সীতাকে অপহরণ করবার জন্য রাবণ একদিন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মৃগ-শাবকের রূপ ধরেছিলেন। হতে পারে, হয়তো সেদিন ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই তিনি মৃগরূপ ধারণ করেছিলেন! এমনও হতে পারে যে তিনি সীতাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিলেন! সম্মোহন দ্বারা হয় না এমন কিছু কাজ নেই; এবং সে সম্মোহন যদি ভারতীয় পদ্ধতিতে হয়······”

অরবিন্দ থামল! চা এসেছিল। চা খেতে-খেতে দু বন্ধুতে আবার চলল গল্প।

অরবিন্দ বলতে লাগল, “আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা এ সব জানতেন। ভোজরাজার গল্পেও এরকম অনেক উপাখ্যান তুই পাবি।”

শঙ্কর বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। এ সব জ্ঞান তার জীবনে হয়তো কাজে আসবে। বলল, “বিক্রমাদিত্য মৃত মানুষকে বাঁচাতে জানতেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ত তা পারে না!”

অরবিন্দ বলল, "আবার আধুনিক বিজ্ঞান যা পেরেছে, পূর্ব্বে তা জানাও ছিল না। কিন্তু মৃত মানুষ বাঁচাতে পারছে না—কারণ, তার জন্যে যে প্রচেষ্টা দরকার, তার সুযোগও ত আমাদের সমাজবিধিতে আর রাষ্ট্রবিধিতে নেই বন্ধু!"

শঙ্কর বলল, "সম্ভবতঃ ভালর জন্যেই এ ব্যবস্থা নেই। আর নেই বলে আমাদের ক্ষতিও হয়নি কিছু।"

অরবিন্দ বলল, "হতে পারে ক্ষতি হয়নি ; কিন্তু পুরাকালে এ প্রক্রিয়া যখন লোকে জানত, তখনই বা আমাদের দেশ কোন্ অংশে ছোট ছিল ? আমাদের যা কিছু গর্ব্ব, পুরাকাল তার অনেকখানি অংশ নিয়ে বসে আছে।"

সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে। এমনি এক রমণীয় সন্ধ্যায় সেদিন অরবিন্দ ছিল তার সাথে। ওর মত বন্ধুর সঙ্গ যথার্থই কাম্য। ওদিকে নারায়ণও এইমাত্র ফিরেছে! সে বলল, "উঠেছ তুমি! কিন্তু এ জায়গাটা ত বিশেষ সুবিধার নয়। এখানেও লোক আমাদের পেছুতে রয়েছে।"

শঙ্কর হেসে উঠল ঃ "আচ্ছা পাগলা লোক তুমি যাহোক! ছায়া দেখেও আঁতকে ওঠ। এস, এঁর সাথে আলাপ করিয়ে দি। ইনি আমার বন্ধু অরবিন্দ বাবু—খুব বড় পণ্ডিত হে—প্রকাণ্ড বড়। এতক্ষণ এঁর কাছে বসে-বসে নানান রকম জ্ঞান আহরণ করছিলাম।"

অরবিন্দ ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকাল নারায়ণের দিকে। তারপর শঙ্করের কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, "বড্ড বাড়িয়ে তুললি রে! অত বাড়াস্ নে, ফেটে যাব। বসুন,

বসুন নারাণ বাবু! গল্প একটু করা যাক্। কেমন দেখলেন জায়গাটা ?"

নারায়ণও হাসল; বলল, "মন্দ কি! সুন্দর! নদীটা চমৎকার!"

অরবিন্দ বলল, "আপনি দেখছি কবি। আপনার তো পুলিশে পোষাবে না।" বলেই সে হাসল হো-হো করে।

সবাই মিলে হেসে উঠল।

এতক্ষণ গুরুগম্ভীর সব আলোচনায় এখানকার বাতাস পর্য্যন্ত কেমন স্তব্ধ হয়ে উঠেছিল। হালকা কথায় ও হালকা হাসিতে আবার সহজ ভাব ফিরে এল।

রাত ধীরে-ধীরে বেড়ে যাচ্ছে।

থানার ঘড়িতে ঢং-ঢং করে আটটা বাজল।

নয়

শঙ্করের ইচ্ছা ছিল, রাতটা থানায়ই কাটিয়ে দেয়। শরীরের কথা চিন্তা করে তাই শঙ্কর ঠিক করেছিল। তা ছাড়া, দারোগা বাবু খাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন বেশ ভালই।

হাজার হোক, একটা থানার ইন্‌-চার্জ দারোগা। তিনি একটা হাঁক দিলে, দশটা রুই মাছ, তিনটে পাঁটা, আর সের-দশেক দুধ পাওয়া যায়। সেখানে আর কথা কি?

শঙ্কর বেশ ভোজন-বিলাসীও ছিল। থাকলে মন্দ হত না; কিন্তু নানা কথা ভেবে থাকতে পারল না।

অরবিন্দ আজ ওখানেই থাকবে নাকি?

দারোগা বাবুও যথেষ্ট অনুরোধ করল থাকবার জন্যে।

হেসে শঙ্কর বিনীতভাবে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলল, "সম্বন্ধ ত ইতিপূর্ব্বেই পাতিয়েছেন আমার সাথে। আবার দেখা হবে। এসে পড়ব এক সময়।"

দারোগা বাবু বললেন, "আচ্ছা। থাকতে যখন পারলেন না, তখন আর পীড়াপীড়ি করে কি হবে? ওরে তেওয়ারী, বাবুদের ষ্টেশনে পৌঁছে দাও! সাবধান হয়ে যেও। তা শঙ্কর বাবু! গরুর গাড়ীতে না গিয়ে হেঁটেই যাবেন নাকি? ঘোড়া আছে—ঘোড়াও নিতে পারেন। তা প্রায় মাইল আড়াই হবে ষ্টেশন।"

শঙ্কর বললে, "তেওয়ারী যখন যাচ্ছে তখন আর ভয় কি?

চল তেওয়ারী, হেঁটেই মেরে দি। আচ্ছা নমস্কার! চললাম রে অরবিন্দ! আছিস ত কলকাতায়—দেখা হবেই। গুড্ নাইট্!”

দারোগা বাবু বললেন, “নমস্কার!”

ভ্রূ কুঁচকে অরবিন্দ বলল, “গুড্ নাইট্!”

নিস্তব্ধ গ্রামের পথ দিয়ে তারা চলেছে। দূরে, এখানে-সেখানে দু-একটা বাড়ীতে আলো দেখা যায়। কোথায় যেন একটি ছেলে চীৎকার করে পড়ছে, “পৃথিবীর এক ভাগ স্থল ও তিন ভাগ জল।”

তিন ভাগ জল থাক্ আপত্তি নাই, আপাততঃ তারা স্থলভাগ দিয়েই চলছে।

তেওয়ারী তার বড় লাঠিটা ঠুকতে-ঠুকতে কি একটা ভজন-গান খুব রসালভাবে মাথা নেড়ে-নেড়ে গেয়ে চলছে।

ওর সঙ্গীতে ব্যাঘাত ঘটান উচিত হবে না।

দূরে এক ঝোপের কাছে দুটো শিয়াল রসজ্ঞের মত “ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া”, বলতে-বলতে ছুটে পালিয়ে গেল।

টর্চ্চ দিয়ে হাতঘড়িটা দেখল শঙ্কর।

মাত্র সাড়ে আটটা। কিন্তু এরই মধ্যে গ্রামের সব চুপ-চাপ। দূরে একটা প্রকাণ্ড বিল। অন্ধকারেও তা চকচক করছে। শঙ্কর তেওয়ারীকে বলল, “কি নামরে ওটার?”

তেওয়ারী বলল, “উসি বিলকা নাম ভূতুড়ে ডাঙ্গাকা বিল। লেকিন উস বহুত খারাপী জায়গা।”

—“খারাপ জায়গা?”

—"জী হুজুর! উধার একঠো বন বি হ্যায়। বদ্‌মাস-উদ্‌মাস উধার রাতপর ঘুমতা-ফিরতা! হামকো থানাকা অন্দর ও-বিল নেহি—হোনেসে হাম দেখায় দেঙ্গা একদফে।"

শঙ্কর হেসে বলল, "তাহলে তুমি খুব সাহসী লোক, বল!"

তেওয়ারী একটু লজ্জিত হাসি হাসল যেন!

বিলের ধার দিয়ে জনা দুই লোক যাচ্ছে। অস্পষ্ট ভাবে তাদের দেখা যায়। বিলের পাশেই আক-ক্ষেতের আল ভেঙ্গে-ভেঙ্গে তারা পথ করে চলছে। ওরাও বোধ হয় ষ্টেশনের যাত্রী।

তেওয়ারীর সেদিকে লক্ষ্য পড়েছে। চীৎকার করে বলল, "আরে কোন্ হ্যায়?"

কোন উত্তর এল না। লোক দুটো থেমে পড়েছে।

তেওয়ারী চীৎকার করে আবার বলল, "এই শালা লোগ! বাত নেই সমজাতা! কোন্ হ্যায়?"

আর কাউকে দেখা গেল না।

শঙ্কর বলল, "কি তেওয়ারী, কি?"

তেওয়ারী খইনি টিপতে-টিপতে বলল, "চোর-ওর হোগা কোন্। ভাগ্ গিয়া শালা!"

আবার সে গলা ছেড়ে গান ধরল :—

"আরে ভাইয়া হো……
এ কেয়া মজাদার ঘুঘনি-দানা……
আরে ভাইয়া হো!"

শঙ্কর বলল, "ওহে, খুব যে ঘুঘনি-দানায় মেতে আছ!"

তেওয়ারী স্মিতহাস্যে বলল, "জী !"

—"তা তোমাদের গাঁয়ের লোক ট্রেণে মরছে, কিছু করতে পারছ না তোমরা ?"

তেওয়ারী ভারিক্কি-চালে বলল, "ক্যায়া করেগা হুজুর ? লেকিন বড়া-বড়া সাহেব-লোগ ঘুস খাকে আসামী ভাগা দেতা ; নেই তো এক রাতমে হাম সব পাকাড়নে সাকতা হুঁ ।"

শঙ্কর বলল, "আচ্ছা, তোমাকেই না হয় নিয়ে যাওয়া যাবে একবার। তা গানটা তোমার চলছিল বেশ—থামালে কেন ? চালাও।"

তেওয়ারী আবার গান আরম্ভ করল, "ভাইয়া হো !"—

এবারে ষ্টেশন দেখা যাচ্ছে। না, রাত এখনো বেশি হয়নি। মোটে স' নয়টা।

শঙ্কর বলল, "বড্ড কষ্ট হয়েছে তেওয়ারী তোমার—এই নেও বকশিষ একটা টাকা।"

তেওয়ারী টাকাটা ট্যাঁকে রাখতে-রাখতে বলল, "নেইজী, কুছ তক্‌লিফ্ নেই হুয়া হুজুর !"

—"তাহলে তুমি যাও এবারে।"

মিলিটারী পদ্ধতিতে একটা স্যেলুট করে তেওয়ারী ফিরে চলল।

দশ

ষ্টেশনে অনেক লোকজন। এই গ্রামের নামই তাহলে ভূতুড়ে ডাঙ্গা! এখান হতেই সুরু হয় শেষরাতে সেই বীভৎস প্রলয়-নাচ!

এখন কিছু বোঝা যায় না। ষ্টেশন বেশ সরগরম।

তারা দুখানা সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কিনে এসে বসল ওয়েটিং রুমে।

ওয়েটিং রুমের দরজা বন্ধ করে ফ্যান খুলে দুইজন বসল কি সব পরামর্শে!

শঙ্কর বলল, "তোমাকে একদিন নিষেধ করে দিয়েছিলাম নারায়ণ, যে অপরের সামনে আমাদের কোন কথা বলা উচিত হবে না। অবশ্য অরবিন্দ আমার পরম বন্ধু, কিন্তু তবু তার সামনেও তোমার একথা বলা উচিত হয়নি যে এখানেও কেউ আমাদের পেছু নিচ্ছে।"

নারায়ণ বলল, "আমি ওঁকে দারোগাবাবু ভেবেছিলাম।"

শঙ্কর বলল, "তার সামনেও বলার প্রয়োজন ছিল না। সে যাক, তোমার খবর কি? ট্রেণ ওয়াচ্ করেছিলে? সবার ওপর লক্ষ্য রাখা হয়েছে ত?"

নারায়ণ বলল, "কোন ত্রুটি হয়নি। সুব্রতকে রেখে এসেছি চার্জ্জে।"

একটা কথা নারায়ণ বলবে কি বলবে না ভেবে, অবশেষে

বলল, "লক্ষ্য আমরা সকলের ওপরই রেখেছি। আপনার বন্ধুকেও আমরা সকালে ষ্টেশনে দেখেছি।"

শঙ্কর বলল, "আমার বন্ধু! কে হে?"

নারায়ণ বলল, "অরবিন্দবাবু। তিনি গিয়েছিলেন, বললেন, তাঁর এক বন্ধুকে তুলে দিতে বম্বে মেলে। তাঁর কাছে অবশ্য গেট্-পাস্‌ও ছিল।"

শঙ্কর বলল, "সবাইকে তোমরা বিব্রত কর না যেন আবার। দরকার হলে ত সবাই যাবেনই!"

নারায়ণ বলল, "হ্যাঁ, বড়সাহেবও সেই কথাই বলছিলেন; কিন্তু তিনি গোপনে ওয়াচ্ রাখতে বলেছেন সবার ওপর।"

শঙ্কর বলল, "নিশ্চয়। ওয়াচ্ রাখতেই হবে। তারপর, ভৈরবীর আস্তানার খোঁজ পেলে?"

নারায়ণ বলল, "প্রত্যেকটি সন্ন্যাসীর ওপরই নজর রাখা হচ্ছে; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই পাওয়া যায়নি। আর শীতলা ভৈরবীর মৃত্যু সম্বন্ধেও আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি। অথচ বুঝতে পারছিনে কি করে তার হাতের চিহ্ন পড়ল গিয়ে লাস-কাটা ঘরে!"

শঙ্কর বলল, "সে সব কথা পরে হবে। আমি এ গাড়ীতেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি; কিন্তু তুমি এখানেই থাকো।"

নারায়ণ তাকাল।

শঙ্কর বলল; "তোমার সাথে ত সুটকেশ আছেই—চেহারাটা পালটে ফেল। তারপর দেখ ও-লোকদুটো কে, যে এখানে আসা থেকেই আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছে! কি উদ্দেশ্যে ওরা

লক্ষ্য রাখছে, কোথায় ওদের আস্তানা, এসব জেনে তারপর যাবে। ঐ দেখ, জানালার পাশ দিয়ে কে যেন উঁকি দিয়ে চলে গেল!"

নারায়ণ উঠে জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, "দুটো লোক টিকিট-ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে।"

নারায়ণের সাথে চোখা-চোখি হতেই তারা নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল আবার!

শঙ্কর বলল, "থাক্। ওরা আমাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছে, নিক। আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখছে। মনে হচ্ছে, এদিকেই একটা-কিছু আস্তানা আছে ওদের। হ্যাঁ, ভাল কথা, যখন যেভাবে থাকো, সংবাদ দিতে ভুলো না যেন!"

নারায়ণ সম্মত হলো।

—"আর একটা কথা। কাল রাতে সেই নটোরিয়াস্ ট্রেণের একটা খালাসীকে আমার ভাল লাগেনি। তার চাল-চলন সন্দেহজনক। নাম বোধহয় কালু। হ্যাঁ কালুই; বেঁটে মতন চেহারা, কালো গাণ্ডা-গুণ্ডা। মজবুত বেশ। কপালের দিকে একটা কালো দাগ আছে। তাকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সে এ-লাইনেই ট্রেণ চালায়। আমি অবশ্য যথাসম্ভব তার খোঁজ নিতে চেষ্টা করব।

ঐ ট্রেণ আসছে। আমি তাহলে উঠি। সাবধানে থাকবে, সাবধান মত এগুবে। হঠকারিতা করো না যেন!"

দূরে দুটি লোক তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

ট্রেণ এসে থামল ষ্টেশনে। শঙ্কর আর নারায়ণ এগিয়ে গেল। শঙ্কর উঠে বসল ট্রেণে। নারায়ণও চড়ল।

ট্রেণ মোশন দিয়েছে। ধীরে-ধীরে চলতে আরম্ভ করল। এবারে অন্ধকারে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

নারায়ণ ট্রেন হতে আলগোছে নেমে পড়ল। রেল-লাইন দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এসে হাজির হলো ষ্টেশনের বাইরে।

এখান হতে দেখা যাচ্ছে লোক দুটোকে। এতক্ষণ ওরা দুজন লক্ষ্য রেখেছিল শঙ্কর আর নারায়ণের দিকে, এবারে নারায়ণ লক্ষ্য রাখবে ঐ দুজনের ওপর।

এগারো

রাস্তায় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। অনেক রাতে শঙ্কর এসে হাজির হলো তাদের বাড়ীতে।

একটু দূরেই একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। নারায়ণ তাহলে পাহারার ব্যবস্থা ঠিকই করেছে!

কড়া নাড়তেই মীরা দরজা খুলে দিল, "তুমি?"

দরজা বন্ধ করতে-করতে শঙ্কর বলল, "হাঁ রে, হাঁ। সকালে আসতে পারিনি।"

মীরা বলল, "আমরা ত ভেবেই মরি! আচ্ছা লোক তুমি শঙ্করদা! একটা খবরও দাও না কোথায় থাকো না-থাকো। হঠাৎ বিপদে পড়লে তখন—"

শঙ্কর হাসল। হেসে বলল, "ওরে ভয় নেই তোর কিছু! তোর শঙ্করদা সহজে মরবে না। তারপর পিসিমা কেমন আছেন রে?"

—"সেই আগের মতই। এখন ঘুমুচ্ছেন।"

—"আচ্ছা তাহলে আর জাগিয়ে দরকার নেই। ভাত-টাত ত নেই—না?"

মীরা বলল, "কি করে থাকবে? একটু আগে ভাতে জল দিয়ে রাখলাম।"

শঙ্কর বলল, "তবে এক কাজ কর—তাই দে। লেবু-টেবু থাকে ত তাই দিয়েই দে। ক্ষিদেও পেয়েছে খুব।"

মীরা বলল,"দাঁড়াও তবে। ইলিশ মাছ রয়েছে সাঁতলানো। তাই ভেজে দি' খানকতক। কি বলো ?"

শঙ্কর বলল, "সে ত চমৎকার !"

শঙ্করের গায়ে দারোগাবাবুর দেওয়া জামা ছিল বলে মীরার এতক্ষণ লক্ষ্য পড়েনি। শঙ্কর জামা খুলতেই দেখল, তার শরীরের নানা স্থান ক্ষত-বিক্ষত।

সবিস্ময়ে মীরা বলল, "এ হলো কি করে শঙ্করদা ?"

শঙ্কর বলল, "কি রে ?"

মীরা সযত্নে সেই ক্ষতগুলির ওপর হাত বুলিয়ে বলল, "এগুলো ?"

শঙ্কর হাসল ; বলল, "সে এক ভারী মজার গল্প। ট্রেন হতে পড়ে গিয়ে এ কাণ্ড।"

মীরা বলল, "তোমার মত ছেলে ট্রেন হতে পড়বে, তা অসম্ভব। লাফ দিয়ে পড়নি ত ?"

শঙ্করকে মীরা ভাল করেই চেনে।

হেসে শঙ্কর বলল, "ধরেছিস ঠিকই। কিন্তু আজ নয়, কাল বল্‌ব ; আজকে একটু ঘুমিয়ে নি'। কি বলিস ?"

মীরা বলল, "সেই ভাল। তুমি ঘুমোও। আমি বাতাস করি।"

শঙ্করের বাড়ীটা ছোট্ট এক ফালি জমির ওপর। সামনেটায় একটুখানি বাগান। বাগানের ও-পাশে প্রায় তাদের বাড়ীর গা বেয়েই একটা চাঁপাগাছ উঠেছে। চাঁপা-ফুল ধরেছে তাতে অজস্র। তারই গন্ধে মীরা আর শঙ্কর কখন ঘুমিয়ে পড়ল !

একটা কি বিশ্রি দুঃস্বপ্নে ঘুমটা পাতলা হয়ে এল শঙ্করের।

বিড়-বিড় করে নিজের মনেই ঘুমের ঘোরে কি যেন বলছে!"

স্বপ্নে তাকে কে যেন এখনও জিজ্ঞাসা করছে, "তারপর কার-কার ওপর তোমার সন্দেহ হয়েছে? কে সে বৈজ্ঞানিক? কার ওপর সন্দেহ তোমার?"

ধীরে-ধীরে ঘুমটা আরো পাতলা হয়ে আসছে, কিন্তু চোখ মেলে তাকাতে পারছে না। তার ঠিক বুকের ওপর কার যেন হিম-শীতল স্পর্শ সে অনুভব করছে!

কে যেন সম্মোহন করার মত করে তাকে বলছে, "ঘুম, ঘুম, ঘুম,—গাঢ় ঘুমে তুমি ঘুমিয়ে পড়। তোমার মনের সব চিন্তা ঝেড়ে ফেল—কি হয়েছে বল আমায়। ঘুম, ঘুম, গাঢ় ঘুম —পৃথিবী ঘুমুচ্ছে—সবার চোখে ঘুম—তোমার চোখেও ঘুম আসুক···ঘুম···ঘুম···ঘুম"···

ঠিক এমনি ঘুমের গানই সে শুনতে পেয়েছিল সেই নটোরিয়াস্ ট্রেনে।

শঙ্কর বুঝতে পারছে, কোন এক অশরীরী মূর্ত্তি রয়েছে তার ঘরের মধ্যে। সে হেঁটে বেড়াচ্ছে—একবার ওদিক যাচ্ছে, একবার আসছে।

কত যাদুকরের কাছেই সে কতদিন কত হিপনোটিজম্ দেখেছে! স্কুলে পড়তে একবার এল এক প্রকাণ্ড ম্যাজিশিয়ান। শুইয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, বলে—ঘুম, ঘুম, গাঢ় ঘুম—আর অমনি সবাই সম্মোহিত! সেও গিয়েছিল সম্মোহিত হবার

জন্যে। কিন্তু মনে-মনে ঠিক করে গেল, কিছুতেই সে হিপনোটাইজ্‌ড্‌ হবে না।

ম্যাজিশিয়ান তাকেও শুইয়ে দিলে অন্যান্যদের সাথে। সবার মত তাকেও বলল, "চোখ বোজ ত খোকা!"

বুজল চোখ। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ম্যাজিশিয়ান বললে—"ঘুমোও! ঘুম, ঘুম, গাঢ় ঘুম!"

সত্যিই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার সেদিন ধীরে-ধীরে অবশ হয়ে এসেছিল। কিন্তু না, সে কিছুতেই ম্যাজিশিয়ানের কাছে ধরা দেবে না।

ম্যাজিশিয়ান ত ভাবলেন সেও সবার মত সম্মোহিত হয়ে গেছে। অন্যান্য সম্মোহিত বালকদের সাথে তারও হাতে একখণ্ড কাগজ দিয়ে সে বলল, "খাও ত খোকা, রসগোল্লা খাও। খুব মিষ্টি। খাও।"

সব ছেলেরা মহানন্দে সেই কাগজ চিবিয়ে-চিবিয়ে খেল।

ও হেসে ফেলল হো-হো করে। বলল, "এ যে কাগজের টুকরো!"

সবার সে কি হাসি! হয়নি—হিপনোটাইজ্‌ড্‌ হয়নি!

সেদিন তাকে পারেনি ম্যাজিশিয়ান সম্মোহিত করতে। আজও তার ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে কেউ তাকে সম্মোহিত করতে পারবে না। অসম্ভব!

বিছানার তলা হতে রিভলভারটা টেনে নিয়ে অতর্কিতে সে লাফিয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ একটা ছায়ামূর্ত্তি যেন সরে গেল জানালাটার কাছে!

চীৎকার করে শঙ্কর বলল, "কে ?"

বলেই জানালার দিক লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল—দ্রুম্ !

অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ করে কে যেন বাঁ-হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে, চাঁপাগাছ বেয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ল !

একটা অস্পষ্ট অথচ দ্রুত পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কে যেন দৌড়ে গেল !

ঘরের সুইচ টিপে আলো জ্বালল শঙ্কর। ঘড়িতে চারটা বেজেছে।

মাথাটা এখনও ঝিম্-ঝিম্ করছে তার।

মীরার দিকে তাকিয়ে দেখল, অঘোরে ঘুমুচ্ছে মীরা। ঘুমোক্।

বড়সাহেব নীচে যে পাহারাওয়ালার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে পাহারাওয়ালাটার চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

সে বলছে, "কোন্ যাতা হায় ?"

শঙ্কর তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল। বললে, "কি রে, কি ?"

—"হুজুর ! এক দুষমন ইধার সে ভাগ গিয়া।"

—"ধরতে পারলিনে ?"

—"নেই হুজুর !"

—"আচ্ছা, তুই চারদিকে ভাল করে নজর রাখিস।"

—"যো হুকুম !" বলে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল।

অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি তাহলে তাকে অনুসরণ করতে এখনো

ভোলেনি! চিঠিও ত আগেই দিয়েছে! কে জানে এই ছায়া-মূর্ত্তির অনুচরদেরই সে ষ্টেশনে অনুসরণ করতে দেখেছিল কিনা!

কিন্তু দুঃখের রাত্রিও ভোর হয়। আজকার রাতও ভোর হলো! শঙ্কর ভাবল, কে এ যাদুকর যে তারই গৃহে প্রবেশ করে তাকে সম্মোহিত করতে চায়?

যেই এ যাদুকর হোক, শঙ্কর নিজের মনে-মনে তারিফ করে এই বলে যে, সে অত্যন্ত শক্তিমান্। দুর্জ্জয় সাহস আর অবিচলিত মনোবিজ্ঞানের বলে সে আজ যাদুকরের যাদুকেও ব্যর্থ করেছে!

খবরের কাগজ ততক্ষণে দিয়ে গেছে। মীরাও চা নিয়ে হাজির।

চা খেতে-খেতে শঙ্কর খবরের কাগজটা খুলে বসল। আজ আবার কোন্ হতভাগ্যের মুণ্ডচ্ছেদের কাহিনী পড়বে, কে জানে? আর নারায়ণকে রেখে এসেছে বলতে গেলে নিতান্তই শত্রুপুরীতে, তারই বা কি হলো কে জানে?

পাতার পর পাতা উল্টে চলল শঙ্কর; নিজের মনেই বলল, "আশ্চর্য্য! কাল রাতে কোন খুন হয়নি ত ট্রেণে! অনেক দিন পর কাল একটা শুভ দিন গেছে যাত্রীদের!"

বারো

কিন্তু কাল যাত্রীদের যত শুভ দিনই হোক না কেন—শঙ্করের পক্ষে ছিল অমাবস্যার রাত।

হাতে এখন তার অনেক কাজ। ব্রজেনবাবুর রিপোর্টটা আর একবার জায়গায়-জায়গায় পড়ে নেওয়া দরকার। ট্রেণযাত্রী এবং তাদের অভ্যর্থনা করে আনতে যারা ষ্টেশনে যায়, তাদের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই লক্ষ্য করা হচ্ছে।

আরে, এ যে দেখছি তার বন্ধু প্রায় রোজই যায় ষ্টেশনে! প্রতিভাশালী মানুষদের কাজই আলাদা। অরবিন্দ বোধ হয় ষ্টেশনই মর্ণিং-ওয়াকের স্থান করে নিয়েছে! মনে-মনে হাসল শঙ্কর। ব্রজেনদার রিপোর্টটা আরো ভাল করে পড়া দরকার।

ড্রয়ার খুলে রিপোর্টটা বের করল।

বেশ সাজিয়ে গুছিয়েই ব্রজেনদা তাদের মহেন্দ্রকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মাঝপথে মহেন্দ্র কেটে না পড়লে এতদিনে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারতেন নিঃসন্দেহ!

রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ভূতুড়ে ডাঙ্গার একটা দুলকে সন্দেহ করেছিল সে। একদিন একজন সন্দেহজনক লোককে অনুসরণ করে মহেন্দ্র দেখেছিল, লোকটা একটা বড় বিলের কাছ দিয়ে যেতে-যেতে একটা বনের মধ্যে ঢুকেছিল, তারপর,

ঢুকেছিল বনের মধ্যে একটা ভাঙ্গাবাড়ীতে। দক্ষিণ দিকে…

তাহলে শঙ্কর ঠিক পথেই এগুচ্ছে!

হ্যাঁ, ব্রজেনদা কালুকেও সন্দেহ করেছিলেন! রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে কালু নূতন ঢুকেছে রেলওয়েতে খালাশী হয়ে। বাড়ী তার ভূতুড়ে ডাঙ্গা ছাড়িয়ে সম্মোহনগঞ্জ আর ঘাড়-মটকার মাঝামাঝি। প্রায়ই তাকে কলকাতা-অঞ্চলে দেখা যায়। বিশেষ করে এসপ্লানেডের কাছে একটা বড় দরের হোটেলে।

ব্রজেনবাবু খবরও নিয়েছিলেন। সে হোটেলের খানসামা কালুর চাচা। তাকে অনেক দিন চোখে-চোখে রেখে দেখা গেল, একদিকে বেচারা সংসার নিয়ে যেমন ব্যস্ত, অন্যদিকে তেমনি নিরীহ গো-বেচারা। সাতদিন পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তাকে পাহারা দিয়ে দেখেছে যে, চাচার দোষের মধ্যে শুধু একটি—হোটেলের বাজার করতে গিয়ে পয়সা চুরি করা।

ব্রজেনবাবু প্রথমে ভেবেছিলেন, চাচার বাড়ীতে বা হোটেলেই চাচার ঘরে কালু এবং তার দলবলের আড্ডা, তাই এত কাণ্ড করেছিলেন। তারপর যখন দেখলেন যে, সে সব কিছু নয়, তখন কালুর এখানে আসাকে আর তেমন দোষণীয় মনে করেন নি।

মোটা লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে-দিয়ে রিপোর্টটা একবার পড়ে নিল শঙ্কর।

নীচে ডাকপিওন এসেছে। পত্র দিয়ে গেল একটা।

বারে মজা! আবারও যে দেখছি সেই রকম টাইপ-করা বিদ্যুদ্‌গতির বিভিন্ন সমাবেশের মধ্যে সেই নরমুণ্ডের লাল ছাপওয়ালা চিঠি!

কি লিখেছে এবারে দেখা যাক।

পত্রটা পড়তে আরম্ভ করল শঙ্কর। লিখেছে:

> ভেবেছিলাম তুমি নরমুণ্ডর ব্যাপারে অগ্রসর হবে না; কিন্তু তবু হয়েছ। আমাদের দলের এক বিশেষ সভায় একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, তুমি যথেষ্ট সাহসের পরিচয়ও দিয়েছ। তোমার সাহসের জন্য একদিকে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং দ্বিতীয় বারের মত তোমাকে অনুরোধ করছি যে, তুমি যদি এ-পথ হতে সরে না পড়, তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ নিতান্তই দুঃখপূর্ণ।

শঙ্কর মনে-মনে হাসল।

ভাল। ভালই বলতে হবে; কারণ, তারা সভা করে তাকে স্বীকার করেছে। তাদের কথা না শুনলে ভবিষ্যৎ তার দুঃখপূর্ণ।

শঙ্কর হাসল, ডিটেকটিভের কাজ সমাজ-সেবার কাজ। এ কাজে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে। মৃত্যুকে ভয় করলে এখানে চলে না।

সে উঠে স্নান করল ভাল করে। কাল রাতে ভাল করে তার খাওয়া হয়নি—আজ পুষিয়ে নিল সেটা।

যাহোক্, এদিককার টুক্‌টাক্ কাজ-কর্ম্ম শেষ করে পরের দিন চলল একবার বড়সাহেবের সাথে দেখা করতে।

লালবাজার পৌঁছতেই অফিস-ইন্‌স্পেক্টর বললেন, "এই যে শঙ্করবাবু! বেশ মানুষ আপনি!"

শঙ্কর হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকাল।

ইন্‌স্পেক্টর বললেন, "আচ্ছা লোক! আমরা ভেবে মরি লোকটা হলো কি! এইমাত্র থানা হতে কে এল সংবাদ নিয়ে, আপনি ও নারায়ণ কলকাতা ফিরে এসেছেন। তেওয়ারী সঙ্গে করে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছেও নাকি দিয়ে গেছে!"

শঙ্কর ইন্‌স্পেক্টারের কথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে বলল, "এই কথা! আমি ভাবলাম কি জানি!"

ইন্‌স্পেক্টর গম্ভীর ভাবে বললেন, "না-না শঙ্করবাবু, সব জিনিষ অমন করে হেসে উড়িয়ে দেবেন না। ধরুন, একটা বিপদই যদি হত, তাহলে আমাদের পক্ষে আপনার খোঁজ নেয়া অসম্ভব হয়ে যেত।"

শঙ্কর হেসে বলল, "সেত ঠিকই। সাহেব আছেন ত?"

ইন্‌স্পেক্টর বললেন, "আছেন। যান, তাঁর সাথে গিয়ে দেখা করুন। তিনি আজ অফিসে এসেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।" অফিস-ইন্‌স্পেক্টার ভদ্রলোক সব-কিছু অত্যন্ত সিরিয়াস্ ভাবেই দেখেন।

ইন্‌স্পেক্টারের কাছ হতে শঙ্কর এবারে পাশের এন্টি-চেম্বার দিয়ে ঢুকল গিয়ে বড়সাহেবের ঘরে।

সাহেব কি একটা জরুরী কাগজ পড়ছিলেন। মুখ তুলে একবার তাকালেন শঙ্করের দিকে। তাকাতেই চম্‌কে বললেন, "হ্যালো ইয়ং মেন! বসো।"

শঙ্কর চেয়ারটা টেনে বসল।

সাহেব রিভলভিং চেয়ারটা শঙ্করের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, "আশা করি কেসটা এর মধ্যে বুঝে নিতে পেরেছ ?"

শঙ্কর মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

সাহেব বললেন, "বেশ ! সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কাজ করে যাও—পেছনে রইলাম আমরা।"

শঙ্কর হাসল। ধীরে-ধীরে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলে চলল তার অভিজ্ঞতার কথা।

সেদিন সাহেবের কাছ হতে বিদায় নিয়ে যাবার পর তার এক বন্ধুর সাথে দেখা···বাড়ী ফিরে বিদ্যুৎ-মার্কা কাটা নরমুণ্ডের চিঠি···ব্রজেনবাবুর রিপোর্ট পাঠ···ইঞ্জিনে করে সেই নটোরিয়াস্ ট্রেনের জন্য যাত্রা···ষ্টেশনগুলির সাধারণ অবস্থা··· ট্রেণের গার্ড, ড্রাইভার ও খালাসীদের কিরূপ মনে হলো সেই অভিমত···সেই ভয়ঙ্কর রাতের অমানুষিক অভিজ্ঞতা···ট্রেণ হতে লাফ···

বড়সাহেব একবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন শঙ্করের দিকে···

···ট্রেণ হতে লাফ দিয়ে কিভাবে কোথায় শঙ্কর পড়ে রইল ···পরের দিন গরুর গাড়ীতে করে থানায় নিয়ে যাবার কথা··· পথে দুটি লোকের সন্দেহজনক গতিবিধি···থানায় আগমন··· দারোগার যত্ন···সেখানে আবার তার সেই বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সাথে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার কল্যাণে দেখা···তার দীর্ঘকালের পুরানো সেই বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কাছ হতে নানাপ্রকারের জ্ঞান আহরণ

…কাল রাতের অভিজ্ঞতা…আজকে সেই বিদ্যুৎ-মার্কা নরমুণ্ডের দ্বিতীয় চিঠি—সব কথাই সংক্ষিপ্ত ভাবে স্থান-কাল বাদ দিয়ে বলল শঙ্কর।

বড়সাহেব বললেন, "বেশ! কিন্তু আমরা এখনও কোন ফল দেখাতে পারছি না শঙ্কর! আমাদের ফল দেখাতে হবে। গভর্ণমেণ্টের হোম-ডিপার্টমেণ্ট পর্য্যন্ত বিব্রত বোধ করছে।"

বড়সাহেব একটু থেমে বললেন, "হোম-ডিপার্টমেণ্ট চিঠি দিয়েছে। স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের লোক আনবার কথা বলছে। কিন্তু সে জিনিষটা তো আমাদের কাছে খুব সুখের হবে না!"

শঙ্কর বলল, "না, স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডকে এ কেস আমরা দেব না।"

সাহেব হাসলেন, বললেন, "কিন্তু আমরা বাধা দেব কোন্ মুখে?"

শঙ্কর বলল,"দিনকয়েকের মধ্যেই যা হয় করব আশা করি।"

বড়সাহেবের কথায় বোঝা গেল, নিজেও তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বললেন, "আমার আনন্দের কথা হচ্ছে আমি উপযুক্ত লোকের হাতেই কাজের ভার দিয়েছি। তোমার কথাই আমি লিখব গভর্ণমেণ্টকে।"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "বিপক্ষ অতি ভয়ঙ্কর। অত্যন্ত সন্তর্পণে তোমাকে প্রতি পদে অগ্রসর হতে হবে।"

শঙ্কর বলল, "কাল রাতে কেউ আমাকে সম্মোহিত করতে এসেছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য, কাল রাতে ট্রেণে কিছু হয়নি!"

সাহেব বললেন, "তোমার ওপর দৃষ্টি পড়েছে তাদের দেখা

যাচ্ছে। এর মধ্যে তোমার জীবনের প্রশ্ন রয়েছে—ইচ্ছা হলে তুমি ছেড়ে দিতে পার এ কেস। গভর্ণমেণ্টের কাছে আমার অখ্যাতি হবে হোক।"

শঙ্কর আবার তাকাল সেই প্রশান্তমূর্ত্তি সাহেবের দিকে। সে বলল, "অনেক দূর এগিয়েছি স্যর! এখন আর পিছিয়ে যাব না। আর ভয় আমি একেবারেই পাইনি।"

সাহেব বললেন, "ভাল কথা! বেশ তাই হোক। নরমুণ্ডের ব্যাপারটা শেষ কর। আমাকে বিচলিত মনে কোর না। তোমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস আমার আছে। আচ্ছা গুড্ নাইট্—

হ্যাঁ, ভাল কথা—নারায়ণের কোন সংবাদ পেয়েছ?"

—"না।"

সাহেব বললেন, "নারায়ণ চতুর। বিপদে পড়লেও সে তার পথ করে নেবে।…হঠাৎ তোমার কাছে যেতে হলো বলে সে যাবার সময় বলে যায়, আমি যেন ভৈরবীর আড্ডার ওপর দৃষ্টি রাখি। সুব্রত তোমার বাড়ীর চার্জ্জে ছিল, আর তেমন কাউকে তখন ভ্যাকাণ্টও পাওয়া যায়নি। আমি নিজেই তদারক করেছি।"

—"আপনি?"

সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, নারায়ণ অন্য কাউকে দিয়ে যা-যা করাতে বলেছিল, আমি শুধু তাই করেছি। . . .

ভৈরবী যে আড্ডায় থাকত, সে আড্ডাটা এখনও আছে এবং পুলিশ-ওয়াচ্ও ঠিক রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি তদন্ত করে দেখলাম, ওটা প্রধানতঃ গাঁজা-ভাঙ্গ খাবার সন্ন্যাসীদের

একটা আড্ডা। অবশ্য ওর মধ্যে দুজন সন্ন্যাসীর গতিবিধি ভাল নয়। তারা দাগী আসামী, চুরির অপরাধে এর আগে বহুবার জেল খেটেছে।"

শঙ্কর বলল, "এমনও ত হতে পারে যে ঐ আড্ডায়ই এমন কেউ আছে—ধরা যাক—সেই দাগী দুটিই, যারা কোন প্রকারে শীতলা ভৈরবীর কবর খুঁড়ে অথবা অন্য কোন প্রকারে শীতলা ভৈরবীর ছাপ সংগ্রহ করে শবাগারে তাই ব্যবহার করেছে। এমনও হতে পারে নরমুণ্ডুর ব্যাপারে এরা অনুচর।"

সাহেব হেসে বললেন, "পারে; কিন্তু কথা হচ্ছে, তাতে সন্ন্যাসীদের লাভ কি? শবদেহ কিছু বহুমূল্য নয়। তারা তান্ত্রিকও নয়।"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "তোমার যুক্তি আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না, কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে নরমুণ্ডুর দলই কোন ভাবে মৃত শীতলার হাতের ছাপ সংগ্রহ করে সন্ন্যাসীর দলটাকে ফ্যাসাদে ফেলবার চেষ্টা করছে! দেখছ না যে আমরা এত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি সন্ন্যাসীর আড্ডাটার ওপর, অথচ ট্রেণের হত্যা কমছে না!"

শঙ্কর কি বলতে গেল।

সাহেব হেসে বললেন, "না। আমার কোন যুক্তিতে তুমি মুগ্ধ হবে তা আমি চাইনে—তুমি যে ভাবে এগোতে চাও, এগোও। আমি তোমার অবর্ত্তমানে যতটুকুন কাজ করেছি তোমার হয়ে, সেটুকু শুধু জানালাম। গুড্ নাইট্!"

সাহেব চান কাজ। তার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, সাহায্য

করতেও প্রস্তুত। কিন্তু কোন যুক্তি দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে রাজি নন। তাতে সুবিধা এই যে, উপরওয়ালার যুক্তিতে না চলে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে চলা যায়। আর বড়-সাহেবও এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক।

শীতলা ভৈরবীর ব্যাপারটার সাথে নরমুণ্ডর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা এবং থাকলে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায় তাই ভাবতে-ভাবতে শঙ্কর রাস্তায় এসে উপস্থিত হলো।

এখনও দিনের আলোয় সারা পৃথিবী ঝলমল্ করছে। শঙ্কর শুনল, কে যেন তার নাম ধরে ডাকল, "হ্যালো শঙ্কর!"

তাকিয়ে দেখল চারদিকে। না, কেউ আর কোথাও নেই! ট্রেণেও শুনেছিল এমনি ডাক।

অশরীরী ছায়ামূর্ত্তির কল্পনা করতে-করতে চারদিকেই শঙ্কর যেন ছায়ামূর্ত্তি দেখতে পায়! শঙ্কর হাসল মনে-মনে।

শ্যামবাজারের দিকে মৃত ভৈরবীর আস্তানা। নমস্য লোক এরা। মরেছে কিন্তু স্মৃতি-কমিটির কাজ চলছে ঠিক।

একটা সরু গলি দিয়ে যেতে হয়। গলিটা এখনও অন্ধকার হয়নি। পশ্চিমের সূর্য্যের আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে গলিটায়। ঐ দেখা যাচ্ছে আড্ডাটা।

খোলার কয়েকটা ঘর। এক দঙ্গল সন্ন্যাসী জুটেছে। সাদা পোষাকে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পরিচিত পুলিশের লোক। না, এখন আলাপ করে লাভ নেই এদের সাথে। কাজ চলছে ঠিক মতই তাহলে।

শঙ্কর ফিরল। এসে দাঁড়াল বড় রাস্তার মোড়ে। ট্রাম ধরবে বলে।

ট্রামে উঠতে যাবে এম্‌নি সময় কে যেন দূরে কোথায় শঙ্করকে ডাকল, "হ্যালো শঙ্কর, হ্যালো!"

না কেউ নেই, দূরে শুধু একটা ভিখারী খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছে। আর তারও কিছুদূর দিয়ে একটা সন্ন্যাসী চলছে তার আস্তানায়।

ট্রামে উঠে বসল শঙ্কর, কিন্তু ভুলতে পারলো না।

স্বরটা বড় পরিচিত!

তেরো

নারায়ণের কথায় এবারে আসা যাক্।

নারায়ণ আর শঙ্করকে যারা অনুসরণ করছিল, তারা খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে যখন দেখল ওরা দুজনেই চলে গেছে, তখন তারা ফিরে চলল।

নারায়ণ বুদ্ধি করে একটা টিকিট-চেকারের সাজ সংগ্রহ করেছিল ; কারণ, ট্রেণের ব্যাপারে কখন কোথায় লাগবে বলা যায় না।

সাজটা সে পরে নিয়েছে। মাথায় তার টুপী। তারপর তাড়াতাড়ি করে লোক দুটির সামনে গিয়ে বলল, "এই !"

লোক দুটি বলল, "কি বলছেন ?"

চেকার বলল, "বলছি, টিকিট না দিয়ে যাচ্ছ কোথায় ?"

লোক দুটির একটি বলল, "টিকিট ! টিকিট কিসের বাবু ? গাঁয়ের লোক এসেছিল কলকাতা যাবে—তাই এসেছিলাম তুলে দিতে।"

আর একজন বলল, "পাশের গাঁয়েই আমাদের বাড়ী।"

চেকার কিছুতেই ছাড়বে না।

লোকজন জমে গেছে অনেক। কেউ বলছে, "দিন, ছেড়ে দিন বাবু—চেনা লোক আমাদের। এ গাঁয়েই থাকে।"

চেকার বলল, "তা হয় না। ছেড়ে দিতে পারি—ডবল ভাড়া দিতে হবে। কি নাম তোমাদের ?"

নারায়ণ বুঝতে পারছে নাম বলবে না ওরা কিছুতেই।

প্রথম লোকটি হাসল, বলল, "আজ্ঞে নাম-ধামের কথা ছাড়ুন, আর ঐ ডবল ভাড়া টাড়াও ভুলে যান। জল খেতে দুজনের কাছ থেকে দুটো টাকা নিন…"

গম্ভীর ভাবে চেকার বলল, "হয় ডবল ভাড়া, না হয় হাজতে থাকতে হবে।"

লোকটি দমে গেল এবারে; বললে, "গরীব লোক আমরা, হাজত খাটিয়ে লাভ কি? তাহলে ডবল ভাড়াই নিন। কিন্তু চেকারবাবু, কাজটা ভাল করলেন না। ষ্টেশন-মাষ্টার বাবুও আমাদের চেনেন।"

গোলমালে মাষ্টার বাবুও এসে হাজির; তিনি বললেন, "ব্যাপার কি? ব্যাপার কিরে খোন্দা বান্দা?"

মাষ্টার বাবু তাহলে এদের পরিচিত! এদের নামও জানেন দেখা যাচ্ছে! কি জানি, সে তাহলে ভুল লোককেই ধরল নাকি?

মধ্যবর্ত্তী বয়স ভদ্রলোকের—পাতলা লিকলিকে। কেমন ধোঁকা লাগ্‌ল তাঁর। কারণ, এ লাইনে এ চেকারকে কখনও দেখা যায়নি ত!

মাষ্টার বাবু লোকটি লিকলিকে হলে কি হবে—লোক পাক্কা। তিনি বললেন, "অমন আলাপ আছে অনেকের সাথে—ওসব হবে না। ভাড়া মিটিয়ে যাও।"

নারায়ণের কানের কাছে মুখ এনে তিনি বললেন, "আপনি কি পুলিশের লোক?"

নারায়ণ হেসে গোপনে তার কার্ডটা দেখিয়ে বলল, "হুঁ।"

মাষ্টার বাবু তখনই মহা তাড়া-হুড়ো করে, ডবল ভাড়া আদায় করে তবে ওদের ছেড়ে দিলেন।

না, পোষাকটা বদলান দরকার এক্ষুনি। নারায়ণ স্যুটকেশ হ'তে বের করল একটা আদ্দির পাঞ্জাবী। পরক্ষণেই তার হলো চোখে চশমা, মাথার কাছে টাক, হাতে রিস্টওয়াচ, ছোট-ছোট গোঁফ।

ষ্টেশন-মাষ্টার সেই লোক দুটোর সাথে ফিস্-ফিস্ করে কি কথা বলছে যেন! মাঝে-মাঝে আবার ধমকাচ্ছে, "চালাকী পেয়েছ? টিকিট না করেই আমাদের চোখে ফাঁকী দেবে?"

লোকদুটো ফিরে চলছে। ষ্টেশন ছাড়িয়ে মাঠে নেমেছে এবারে। নারায়ণ বহু দূর দিয়ে-দিয়ে তাদের ফলো করছে।

মাঠের কাছে আরো দুটি লোক ছিল। তারা এসে যোগ দিয়েছে প্রথম দুজনের সাথে।

চলছে তারা ধীরে-ধীরে। নারায়ণও চলছে পিছু-পিছু।

অকস্মাৎ তার ঠিক সামনে লাফিয়ে পড়ল কে একটা গাছ হতে! নিমেষের মধ্যে হাতের লাঠি দিয়ে নারায়ণের মাথায় এক আঘাত। হাত হতে রিভলভার ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে।

অতর্কিতে এমন ভাবে আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না আমাদের নারায়ণ। ধীরে-ধীরে তার জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে।

শেষ-রাতের দিকে নারায়ণের জ্ঞান ফিরে এল। একটা ঘরের মধ্যে সে বন্দী। একটি মাত্র জানালা। না, জানালা ভেঙ্গে পালাবার পথ নেই।

দূরে একটা সভা বসেছে। দেখা যাচ্ছে না কাউকে।

কে যেন বলছে, "শালা ভেবেছিল আমাদের হাজতে পূরবে—টিকিট চায়! তারপরেই আবার ভোল বদ্‌লে—চোখে চশমা, মাথায় টাক, আর আদ্দির পাঞ্জাবী দিয়ে ভুলাতে এসেছিল খোদ্দা-বান্দাকে। বাছাধন, এখন বোঝ ঠ্যালা! আসুন কর্ত্তা—ইলেকট্রিকের যন্ত্রটায় ঘ্যাঁচ করে গলাটা নাবিয়ে দিলেই হবে। করাচ্ছি তোমার গোয়েন্দাগিরি—"

আর একজনের কথাও বোঝা যাচ্ছে। সে বলছে, "দেখেই বুঝলাম, শ্রীমান্ ত আমাদের রেলোয়ের নয়। কায়দা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'পুলিশের লোক নাকি হে?' ব্যস, একেবারে কার্ডটাই দেখিয়ে দিল!"

—"হা-হা-হাঃ!" হাসির রোল উঠেছে।

ও, তুমি! ষ্টেশন-মাষ্টার—তুমিও আছ এর মধ্যে? তাই ত বলি, কেউই নেই যদি তাহলে ধরা পড়ছে না কেন এতদিন?

আরেকজনের গলাও শোনা যাচ্ছে,—"কিরে কালু? খবর কি ওদিকের?"

কালু! কালু, তুমিও এখানে? বেশ আড্ডাটি করেছ ত!

খনখনে আওয়াজ করে কালু বলল, "ওদিককার খবর ভালই। শঙ্কর শালাকে শেষ না করলে বড্ড অসুবিধে দাঁড়াচ্ছে। কর্ত্তা সেই দিকেই নজর দিচ্ছেন। তা তিনি কাজ গুছিয়ে

নিচ্ছেন বেশ তাড়াতাড়িই। শালা তাকাচ্ছিল একদিন আমার দিকে এম্‌নি ভাবে যেন খেয়ে ফেলবে! দেখছি, এখানকার পাত্তা গুটোতে হবে শীগগিরই।”

পাশেই একটা প্রকাণ্ড হলঘর। সেখান হতে কেমন একটা দুর্গন্ধ আসছে!

মাথায় লাঠির আঘাতটা চন্‌-চন্‌ করে উঠছে তখনও। কিছুই ভাবতে ইচ্ছা করছে না। পাশ ফিরে শঙ্কর শুয়ে রইল। ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

ঘুম ভাঙ্গল তার পরের দিন, না কোন্‌ দিন, কে জানে অনেক বেলাতে! ঘুম এখন ভাঙ্গত না হয় ত! কে যেন কোথায় খানিক আগে কোন দেব-মূর্ত্তির কাছে নিজের কামনা জানাচ্ছিল! তারই শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন আর শোনা যাচ্ছে না।

এ যে দেখছি ইতিমধ্যে ঘরে কেউ প্রবেশও করেছিল!

হাতে বেশ মজবুত লোহার হাতকড়ি লাগিয়ে দিয়ে গেছে নারায়ণকে। বাঃ, কি চমৎকার! পায়েও ডাকাতদের মত বেড়ী! রসিক আছে লোকগুলো!

ঘরের মধ্যে খাবার রেখে দিয়ে গেছে। আপাততঃ খেয়ে নেয়া যাক। ক্ষিধে পেয়েছে দুরন্ত।

গরম দুধের ব্যবস্থাও রয়েছে আবার! গোটাকতক কলা—দুটো আপেল—নাশপাতি একটা বেশ বড় গোছের। এক গ্লাশ জলও রয়েছে পাশে। তা ব্যবস্থা মন্দ করেনি।

অন্ততঃ হাত দুটো খোলা থাকলে আরো পরিতৃপ্তির সাথে আহার করা যেত।

কিন্তু রসিক হলেও কাঁচা কাজ করতে এরা রাজী নয় দেখা যাচ্ছে। একে ত ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ—তাতে আবার হাতে-পায়ে বেড়ী!

একমাত্র ওপরের স্কাই-লাইট দিয়ে একটু আলো-বাতাস আসছে। তবে যতটুকুন আসছে, তা একজনের পক্ষে যথেষ্টই, এ অবস্থায়।

এতক্ষণ ঘরের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় পায়নি নারায়ণ। খেয়ে-দেয়ে হাতকড়ি আর বেড়ী নিয়েই উঠল।

পায়ের বেড়ীটা বেশ বড়ই। হাঁটা-চলা করা যায় আস্তে-আস্তে। হাত দুটো এক সাথে করলে খেতেও অসুবিধা হয় না।

ঘরে একটা দরজা, একটা জানালা। দুটোই বন্ধ। জানালাটা খোলা থাকলে মন্দ হত না। প্রথম যেদিন সে এল, সে রাতে খোলা ছিল মনে হচ্ছে। সেদিন একটা দুর্গন্ধ আসছিল জানালাটা দিয়ে। প্রকাণ্ড একটা হুন্ঘর এ জানালাটার পাশেই। সেটা দেখা যাচ্ছে না ত!

ঘরের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে নারায়ণ দেখতে লাগল।—

একটা লোহার খাট আর একটা লোহার টেবিল। বিছানার মধ্যে একটি কম্বল।

দয়াময়রা তবু যে দয়া করে এ সব জিনিষের বন্দোবস্ত করেছে, এজন্য ধন্যবাদ।

দুর্গন্ধটা আবার আসতে সুরু করেছে।

দরজা খুলে কে যেন হল্‌ঘরে ঢুকল! হল্‌ঘর দিয়েই এঘরে আসতে হয়।

ঢোক বাবা, ঢোক। এস তোমরা চাঁদ-বদনের দল! দেখা যাক তোমাদের।

না—কেউ ঢুকল না।

ও ঘরে কার অস্ফুট কথা শোনা যাচ্ছে। দরজাটার ফাঁক দিয়ে ঘরটা দেখা যাচ্ছে এবারে। হল্‌ঘরটার ভিতর অনেক কষ্টে একটি মাত্র অংশ চোখে পড়ে।

প্রকাণ্ড একটি কালীমূর্ত্তি। এমন ভয়ঙ্কর প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি সে দেখেনি কোন দিন। মুণ্ডমালা গলায় ধারণ করে উলঙ্গ ভৈরবীর মত নৃমুণ্ডমালিনী মা বীভৎস-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আশে-পাশে মুণ্ডহীন কয়েকটি মৃতদেহ, আর তার সামনে প্রার্থনায় রত একটি লোক। চেনা যাচ্ছে না তাকে। বোধহয় সর্দ্দারই হবে। বেশ উঁচু লম্বা।

লোকটি কালীমূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে একমনে আরাধনা করে যাচ্ছে। কি বলছে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল নারায়ণ।

সে বলছে, "দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর মা! তোমার রক্ত-পিপাসা মিটাতে কত শবদেহ আনলাম মা আজ পর্য্যন্ত। তুমি ত জাগলে না মা! ওঠ মা, জাগ, আমায় শক্তি দাও, আমি এখনও প্রাণ দিতে পারছি না তাদের। মৃতদেহ শুধু পচে যাচ্ছে—কথা তারা কয় না মা—কথা বলে না।"

লোলজিহ্বা বের করে মা করালবদনী শুধু যেন ভ্রূকুটি করে হাসছেন!

ওদিকে আরাধনা চলছে, "এখনও সম্মোহন-শক্তিকে আমি পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারিনি। দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, শেষ-রাতে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য আমার কিছু শক্তি জেগে ওঠে। মাঝে-মাঝে আমার নিজের ছায়া দেখে আমি চমকে উঠি! দিনের বেলা আমি ইচ্ছা করলেই পূর্ণ ছায়া-মূর্ত্তিও ধারণ করতে পারি না। যা পারি, তা অস্পষ্ট—আবছা।

আমায় শক্তি দাও মা, পূর্ণশক্তি দাও শক্তিদায়িনি! যে শক্তির কাছে বিশ্ব একদিন নত হয়েছিল ভারতের পদপ্রান্তে, আমায় সেই শক্তি দাও।"

শোনা যাচ্ছে না আর।

আবার অস্ফুট কথা শোনা যাচ্ছেঃ "মানুষের মঙ্গলই আমার কাম্য। ধ্বংসের মধ্য দিয়েই আসবে সে মঙ্গল। বন্যায়, মহামারীতে, রোগে-শোকে, দুঃখে অনাহারে, হাজার-হাজার মানুষ মরছে দিন-দিন। আমাকে শক্তি দাও; আমি দিতে চাই—মানুষের মধ্যে অমরত্বের সন্ধানঃ মৃতকে প্রাণ দেবার শক্তি—বিক্রমাদিত্যকে একদিন যে শক্তি দিয়েছিলে তুমি। আমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সম্মিলিত কর মা তোমার দয়া, তোমার আশীর্ব্বাদ।"

নারায়ণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল, মনে-মনে বললে, "শয়তান! সম্মোহন করে মানুষের জীবন নষ্ট করছ তুমি মানুষের কল্যাণের জন্য? শয়তান! প্রাণ দেবে মৃত আত্মায়?"

বন্দী নারায়ণ নিষ্ফল আক্রোশে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হল্‌ঘর হতে আবার শোনা যাচ্ছে ঃ "আমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে চারদিকে। বোধহয় আমাকে চিনেছে তারা! তাদের কণ্ঠরোধ করতে শক্তি দাও। শক্তি দাও, শক্তিদায়িনি!"

হ্যাঁ, তাদের কথাই বলছে শয়তান। হায়রে! বন্দী সিংহের মত নিষ্ফল আক্রোশ ছাড়া কিছুই করবার নেই নারায়ণের!

পচা দুর্গন্ধ আসতে আরম্ভ করেছে আবার। হল্‌ঘরের মাঝে গলিত মৃতদেহগুলির দিকে তাকাতেও ভয় করে!

কে এ শয়তান, নারায়ণ বুঝতে পারছে না কিছু; কিন্তু এই সেই বৈজ্ঞানিক—যে এনেছে ধ্বংস।

ঘরের দরজা খুলে কে যেন ঢুকল!—খোন্দা!

সে বলল, "বাবুর ঘুম ভেঙ্গেছে? কিন্তু সর্দ্দার জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছেন, তোমরা আমাদের পেছু নিয়েছ কেন? কি উদ্দেশ্য তোমাদের?"

নারায়ণ বলল, "শুধু এই প্রশ্ন, না আরো কিছু আছে?"

খোন্দা-বান্দা প্রখর দৃষ্টিতে তাকাল নারায়ণের দিকে। বলল, "এ আড্ডার খবর পেয়েছ কিনা তাও আমাদের জানা আবশ্যক।"

নারায়ণ হাসল, "না জানা পর্য্যন্ত মুক্তি নেই, এই ত?"

খোন্দা বলল, "ছোঁড়াটা চালাক আছে। ধরেছে ঠিকই। না খেতে পেয়ে অন্ধকারে পচে মরবে?"

নারায়ণ বলল, "বেশ। উত্তর দুটোই পাবে। তবে আজ নয়—যেদিন সময় আসবে, সেদিন।

ওদিকে কালু এগিয়ে এসেছে অদ্ভুত একটা যন্ত্র নিয়ে। বলল, "তবে মাথাটাই তোমার এগিয়ে আনো! এই যে দেখছ বোতাম, এটি টিপলেই একখানা ঝক্‌ঝকে ব্লেড বেরিয়ে আসবে! ব্যস, মাথাটা তোমার খ্যাচ্‌ হয়ে যাবে!"

নারায়ণ মনে-মনে হাসল। সে ভাবল, পয়সার লোভে মানুষ চুরি করে, ডাকাতি করে—এরা করছে হত্যার সাহায্য! মন্দ দলটি জোটেনি ত!

খোন্দা বলল, "তাহলে শেষই করবি নাকি ওকে? কিন্তু সর্দ্দারের হুকুম পেয়েছিস তো?"

কালু বলল, "সর্দ্দার পূজোয় বসেছে। দেখ্‌ ত বান্দা, পূজো হয়ে গেছে কিনা! জিজ্ঞেস করে আয় একে কি করা হবে!"

বান্দা চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল। বলল, "সর্দ্দার বললেন, খুব সাবধানে একে রাখতে। হত্যা করার দরকার এখন নেই। কি কি জানে, তা জেনে নিতে আদেশ দিয়েছেন আমাদের।"

কি যেন পরামর্শ হলো এরপর খোন্দা, বান্দা, আর কালুর মধ্যে। যন্ত্রটা নিয়ে তারা চলে গেল।

খানিক পরেই কালু আবার এল, আরো যেন কারা এল তার সাথে!

সবাই মিলে নারায়ণকে নিয়ে চলল আর একটা ঘরে।

ঘরটা বন্ধ। আলো-বাতাস নেই। নারায়ণ বাধা দেয়নি তা নয়—কিন্তু এখানে এদের দলে বাধা দিয়ে সে কি করবে ?

ঘরটার মধ্যে তাকে বন্ধ করে বাইরে তালা লাগান হলো। যাবার সময় কালু বলল, "কি কি জান, সব না বলা পর্য্যন্ত এখান হতে বাইরের আলো-বাতাস দেখতে পাবে না।"

চারদিক শুধু অন্ধকার। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে মাঝে-মাঝে দমকা বাতাসে পচা মানুষের দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। এমনি করেই হয়ত তাকেও পচে মরতে হবে! নারায়ণ ভাবতে লাগল, "শঙ্কর বলেছিল তাকে খবর দিতে; কিন্তু হায়রে, কি করে তাকে সংবাদ দেবে সে ?"

অন্ধকারে হাতড়িয়ে-হাতড়িয়ে ঘরময় সে ঘুরতে লাগল। দেয়ালে মাথা লেগে কেটে গেল বুঝি খানিকটা! না বেরুবার কোন পথই নেই। এখানেই তাকে থাকতে হবে—কতকাল, কে জানে ?

এমনি করে তাদের দিন কাটে। কেবল দিনের মধ্যে একবার ওরা জিজ্ঞেস করে যায় কিছু বলবে কিনা! আগের মত আর স্পষ্ট ভাবে ওদের সভার আলোচনা শোনা যায় না। কিন্তু গভীর রাতে থেকে-থেকে এক-একদিন সর্দ্দারের প্রার্থনা শোনা যায়। দুর্গন্ধ ভেসে আসে।

চৌদ্দ

শীতলা ভৈরবীর আড্ডা হতে শঙ্কর শীষ্ দিতে-দিতে সেদিন ফিরল যথা সময়েই। তারপর, হাতমুখ ধুয়ে সে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়টা মনে-মনে একবার আলোচনা করে দেখতে বসল।

নটোরিয়াস্ ট্রেণে মানুষের মৃত্যু কি ভাবে হয়, তা সে নিজে উপলব্ধি করেছে। কি উদ্দেশ্যে এ হত্যাকাণ্ড হয় তা পরিষ্কার বুঝতে না পারলে'ও এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, কোন অশরীরী বৈজ্ঞানিক কোন বিষয়ে পরীক্ষায় রত। তার সাফল্য না আসা পর্য্যন্ত, এ হত্যাকাণ্ড থামবে না।

ভূতুড়ে ডাঙ্গার সেই বিলের দিকে একটা আড্ডা আছে, এটা ঠিক। কিন্তু আড্ডার কর্ণধার চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ান, এও ঠিক। কারণ, ট্রেণের সম্মোহনকারীই যে তাকে সম্মোহন করতে এসেছিল এবং ট্রেণে-দেখা ছায়ার অনুরূপ ছায়াই যে সে এখানেও দেখেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ট্রেণটার যাত্রীদের নাম ও ষ্টেশনে যারা যায়, তাদের লিষ্টটা পরীক্ষা করে তা থেকে বিশেষ কোন উপকার পাওয়া না গেলেও, কয়েকটা বিশেষ-বিশেষ নাম ইতিপূর্ব্বেই শঙ্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সন্দেহ-ভাজন লোকদের প্রাত্যহিক চিঠির রিপোর্টও রাখা হচ্ছে।

এছাড়া দু-একজন বড় দরের লোকের নামও আছে

ঐ তালিকায়। বন্ধু-বান্ধবদের অভ্যর্থনা করতে তারাও সে সময়ে ষ্টেশনে যায়।

এ সব কথা আগেও নারায়ণের কাছে শুনেছে সে। পুলিশ অবশ্য এখন আর কাউকে সন্দেহ করে না, তবে আগের মতই লক্ষ্য রেখেছে।

গভীর মনোনিবেশ-সহকারে ভাবতে বসল শঙ্কর। ক্রমশঃ সমস্ত ব্যাপারটাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে!

শব-চুরির ব্যাপারটাও আর তত গোলমেলে মনে হচ্ছে না। একটা বিষয় অতি স্পষ্টই হয়ে উঠেছে যে নরমুণ্ডর পরিচালক তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্নই শুধু নন—অদ্ভুত তার বুদ্ধি। সন্ন্যাসীর আড্ডায় পাহারা বসানোতে মাঝে দু-একদিন সে নরহত্যা কমিয়েছিল। কিন্তু নারায়ণের তদারকে যাওয়ায় তারা বুঝতে পেরেছে সন্ন্যাসীদলের ওপর দৃষ্টি যতখানিই থাক্—ভূতুড়ে ডাঙ্গাকেও তারা ভোলেনি। কিন্তু পরিচালক এখনও পূর্ণ-ভাবে বুঝতে পারছেন না যে পুলিশের দৃষ্টি প্রধানতঃ ভৈরবীর আড্ডার ওপর, না তাদেরই ওপর!

শুধু এক জায়গায় খটকা রয়েছে এখনও। শীতলা ভৈরবীর হাতের ছাপ শবাগারে কি করে গেল, এ বিষয়টা তার পরিষ্কার হয়নি। এ বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেলেই শঙ্কর জাল গুটিয়ে আনবে।

সে হাসল একবার মনে-মনে। বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল একবার। তিন-চার জন সাদা পোষাক পরিহিত ভদ্র-যুবক তার বাড়ীটার চারদিকে ঘুরছে। সুব্রতকেও দেখা যাচ্ছে তাদের সাথে।

বাড়ীর সামনে রয়েছে পাহারাওয়ালা।

কাল রাতে ভাল করে ঘুম হয়নি তার—তাড়াতাড়ি করেই সে শুয়ে পড়ল।

ঘরের আলোটা জ্বালাই থাক্। সেদিনকার রাতের কথা মনে হলে শঙ্কর কেমন মুসড়ে পড়ে! কেউ এসেছিল ঠিক। অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি সে দেখেছে। গুলি খেয়ে সে পালানোর সময় নিজের মূর্ত্তি নিয়েই পালিয়েছে; কারণ, পাহারাওয়ালা দেখেছে তা।

বিছানার নীচে রিভলভারে টোটা ভরে সে শুয়ে পড়ল।

না। এক ঘুমেই রাত কাবার করে দিয়েছে। রাতে কিছু ঘটেনি।

বেশ পরিষ্কার নিটোল একটি ঝরঝরে ঘুম হয়েছে কাল রাতে। কিন্তু ভারী বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছে নারায়ণকে নিয়ে। নারায়ণ যেন পাগলের মূর্ত্তিতে শঙ্করকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে!

এ ছাড়া রাতে আর কিছু ঘটেনি।

রাতে কিছু ঘটেনি, কিন্তু নারায়ণ ফিরছে না ক'দিন ধরে; তার সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে না কিছু।

শঙ্কর একটু চঞ্চল হয়ে উঠবে বৈকি!

চুপ করে থাকা আর সঙ্গত হবে কিনা তাই ভাবল খানিকক্ষণ। বর্ত্তমানে তার পক্ষে এ স্থান ত্যাগ করা উচিত হবে কিনা অথবা সুব্রতকে পাঠাবে কিনা, তাই ভাবল কিছুক্ষণ।

মুণ্ডহীন কয়েকটি মৃতদেহ, আর
প্রার্থনায় রত একটি লোক।

[পৃঃ—৮৯

না। দরকার হলে সুব্রতকেই পাঠাবে। এখানকার কাজ আর একটু দেখে কাল-পরশু দরকার হলে সে নিজেই যাবে না হয়।

হাত-মুখ ধুয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে বসল সে।

কালও তিনটি হতভাগ্যের নরমুণ্ড পাওয়া গেছে! তিনটি নরমুণ্ড যেন তার শরীরে তিনটি চাবুকের দাগ!

নীচে একটা মোটর-বাইক এসে থামল।

মীরা এসে খবর দিল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন তোমার সাথে। এই তাঁর কার্ড—

ডক্টর অরবিন্দ মুখার্জ্জী, ডি-এস-সি (লণ্ডন)

আনন্দে শঙ্করের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এ যে না চাইতেই জল! ভালই হয়েছে, কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া যাবে।

বলল, "যা—যা, শীগগির গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়। না, না, থাক্, আমিই ডেকে আনছি।···হ্যালো···আয় অরবিন্দ, আয়··· তারপর আছিস কেমন? কি রে, হাতে কি হয়েছে?"

হাতের একটা আঙ্গুলে একটা ব্যাণ্ডেজ।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল অরবিন্দের।

তারপর হেসে বলল, "ও আঙ্গুলের ব্যথাটার কথা বলছিস? সেদিন রাতে এক মজার কাণ্ড হলো···ল্যাবরেটরীতে কাজ করছি, একটা টিউব ফেটে গিয়ে হাতের ওপর পড়ল এক ঝলক

য়্যাসিড। ব্যস, দিনকতক ভুগলাম! ভাল হয়ে আসছে।… তারপর তুই আছিস কেমন?"

শঙ্কর বলল, "ভালই আছি।"

অরবিন্দ ঘরটা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল, "বাঃ! আর্টিষ্টিক টেস্ট আছে রে তোর—বেশ সাজান-গোছান পরিষ্কার ঘরটি! চাঁপাগাছও লাগিয়েছিস ঘরের পাশে—ফাইন!"

শঙ্কর হাসল, "হলুমই বা পুলিশের কাজ করি, একটু টেস্ট থাকতে দোষ কি? কতদিন ভেবেছি তুই আসবি—আসিসনে।"

অরবিন্দ বলল, "দেখা ত হয় তোর সাথে প্রায়ই…তুই ত গেলি না কোনদিন! চল্ না একদিন যাবি।"

শঙ্কর বলল, "যাব, নিশ্চয়ই যাব।"

—"যাস্ একদিন। গল্প করা যাবে বসে-বসে।"

—"আর তোর ল্যাবরেটরীটাও দেখব, কি বলিস? আরে, গল্পই করছি! খেয়ালই নেই—চা খাবিনে? চা আনাই। কি খাবি আর বল্।"

—"কিচ্ছু না, শুধু এক কাপ চা-ই খেয়ে নিই। ক'দিন ধরে বড্ড ঝামেলায় চলছি। তারপর তোর কদ্দূর রে?"

শঙ্কর বলল, "কিসের? ও নরমুণ্ডর কথা বলছিস? তার কিনারা প্রায় হয়ে এল।"

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল অরবিন্দ। এত লেখাপড়া শিখল, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকানো অভ্যাস এখনও তার গেল না!

শঙ্কর বলতে লাগল, "কালকের মধ্যেই ও-ব্যাপারটা শেষ হবে মনে হচ্ছে। আজই দলটাকে গ্রেপ্তার করব। বুঝলি

কি না—শ্যামবাজারের দিকে এক সন্ন্যাসীর আড্ডা—সেই আড্ডার লোকজনের কাজ হচ্ছে এসব !”

অরবিন্দ বলল, “তাই নাকি ? ওসব লোককে দস্তুরমত ফাঁসি দেওয়া দরকার।”

চা এসে গেছে। চা খেতে-খেতে দু-বন্ধুতে আবার গল্প জমে উঠল। অরবিন্দকে কোনদিনই সহসা মুখ খোলানো যায়নি ; কিন্তু কোন রকমে একবার বিজ্ঞান ও পুরাকালের সম্মোহন-বিদ্যার তালে এনে ফেলতে পারলেই হয়—ব্যস্ ! আর দেখতে হবে না ! ফর্-ফর্ করে খই-ফোটার মত মুখ দিয়ে কথা বেরোতে থাকবে।”

শঙ্কর বলল, “তুই সেদিন থানায় বসে এই সব পুরাতত্ত্ব ও সম্মোহন ইত্যাদির আলোচনা করে আমাদের এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করেছিস। সাহেব পর্য্যন্ত তোকে প্রশংসা করেছেন।”

অরবিন্দ বলল, “তুই দেখছি অনেক বাড়িয়ে তুলেছিস। তারপর সন্ন্যাসীর দলটাকে যখন আবিষ্কারই করতে পেরেছিস তখন দেরী করছিস কেন ধরতে ?”

শঙ্কর বলল, “সেই ত মুসকিল ! একটা বিষয় এখনও আমাদের কিছুতেই পরিষ্কার হলো না যে শীতলা ভৈরবী যদি মৃতই হবে, তাহলে তার হাতের ছাপ শবাগারে পাওয়া গেল কি করে ?”

অরবিন্দ হো-হো করে হেসে বলল, “এই বুদ্ধি নিয়ে তোরা করিস গোয়েন্দাগিরি ! শীতলা ভৈরবীর হাতের ছাপ তাদের আড্ডার এদিকে-সেদিকে অজস্র পাওয়া যাবেই।

তারপর সেই ছাপের ফটো তুলে প্লাস্টার দিয়ে হাতের ছাপ তুলে ব্যবহার করেছে শবাগারে।”

প্লাসটার! হাঁ, ঠিকই ত! শঙ্কর মনে-মনে ভেবে দেখল, এ সহজ কথাটা তার মনে হয়নি এতদিন!

আনন্দে সে অরবিন্দের পিঠ চাপড়ে উঠল। একটু থেমে বলল, “আর একটা কথাও আমাদের পরিষ্কার হয়নি। ট্রেণের নরমুণ্ডর ব্যাপারে দেখা গেছে সম্মোহিত করে হত্যা করা হয়। আচ্ছা, তুই কি সত্যিই সম্মোহন-বিদ্যা বিশ্বাস করিস্? অবশ্য সেদিনও এ বিষয়ে অনেক কথা তুই বলেছিলি।”

অরবিন্দ হাসল। জ্ঞানী লোকের হাসি।

হেসে বলল, “একদিন ছেলেবেলায় আমি ওর চর্চ্চা করেছিলাম—তারপর বিলেতেও কিছু-কিছু বই পড়েছি; দেখেছি, এ দ্বারা না-করা যেতে পারে এমন কিছু নেই। আর সেদিনও বলেছিলাম, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যদি সম্মোহন-বিদ্যা পরিচালনা করা যায়, তাহলে পরিশেষে মানুষের বহুবিধ উপকারে আসবেই।”

শঙ্কর অবিশ্বাসের হাসি হাসল; বলল, “কিন্তু আমি সম্মোহনে বিশ্বাস করি না।”

অরবিন্দ বলল, “করিস্ না? আচ্ছা, আমাকে চেষ্টা করতে দে। তুই শুয়ে পড়্ ত—অবশ্য আমি এ বিজ্ঞান বিশেষ আয়ত্ত করিনি।···আচ্ছা, আমার চোখের দিকে তাকা তো!”

ছেলেবেলা এমনি করেই সে ধরে-ধরে হিপনোটাইজ্ করত

ক্লাশের ছেলেদের। সত্যি অরবিন্দের শক্তি আছে। চোখ দিয়ে যেন আদেশ ফুটে বেরুচ্ছে!

শঙ্কর হাসল। হেসে বলল, "পরীক্ষা আর একদিন হবে ভাই! আজ থাক্, শিখিয়ে দিস্ ত কায়দাটা। পুরাকালের লোকদের মত অশরীরী হয়ে মজাসে চোর-ডাকাত ধরা যাবে বসে-বসে।"

অরবিন্দ একটু হাসল শুধু! শঙ্কর বিশ্বাস করবে না—অথচ পরীক্ষা করতেও রাজী করান গেল না, তাই অরবিন্দের হাসিতে ফুটে উঠল ব্যর্থতার রেখা।

ধীরে-ধীরে অরবিন্দ বেরিয়ে গেল। যাবার সময় আবার প্রাণখোলা হাসি, "যাস একদিন কিন্তু! কেমন? আচ্ছা, গুড্ বাই!"

শঙ্করও প্রতি-নমস্কার করল তাকে। "যাব, নিশ্চয়ই যাব। খুব শীগগিরই দেখা পাবি আমার।"

ভ্রূ কুঁচকে অরবিন্দ একবার তাকাল শঙ্করের দিকে। তারপর ধীরে-ধীরে চলে গেল।

শঙ্করেরও আজ অনেক কাজ। দেরী করলে চলবে না তাকে। সেও এল বাইরে। একটা ট্যাক্সী করে চলল পুলিশ-কমিশনারের সাথে দেখা করতে।

ট্যাক্সী ছুটে চলল।

শঙ্কর তার মুখের হাসি যেন হারিয়ে ফেলেছে! নারায়ণেরও

কোন খবর নেই কতদিন ধরে। আশ্চর্য্য, কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছে না তার!

ধীরে-ধীরে ট্যাক্সী এসে থামল পুলিশ-কমিশনারের বাড়ীতে। বাড়ীতেই ছিলেন বড়সাহেব।

ভেবে-ভেবে বড়সাহেব যেন বুড়ো হয়ে গেছেন একেবারে! তবু স্মিতহাস্যে শঙ্করকে অভ্যর্থনা করলেন, "খবর কি? ফোনে জানালেই ত পারতে।"

শঙ্কর বলল, "আপনার সাথে বিশেষ কতকগুলি পরামর্শ আছে।"

দুজনে এসে বসল বসবার ঘরে।

সাহেব বললেন, "তারপর? কিছু হলো কূল-কিনারা? সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট হতে আবার জরুরী পত্র এসেছে। এরাই দেখছি···না শঙ্কর, ভেবে-ভেবে আমি কিছু ঠিক করতে পারছিনে।"

শঙ্কর বলল, "আমার মনে হয় স্যর আমরা জয়যুক্ত হব। বৈজ্ঞানিককে ধরা আমাদের পক্ষে কঠিন নাও হতে পারে! আর একটা কথা আমার মনে হচ্ছে যে, যদি বৈজ্ঞানিক তার পরীক্ষায় একবার জয়যুক্ত হতে পারে, তাহলে তাকে আটকানো কঠিন হবে। কিন্তু ভারতীয় এ-সব পদ্ধতিতে পবিত্রতা চাই। শরীরের কোন অঙ্গহানি থাকলে তার পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন।"

সাহেব চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি কাউকে সঠিক ভাবে সন্দেহ করেছ!"

—"হ্যাঁ স্যর, ঠিক তাই।" শঙ্কর বলতে লাগল, "এবং আমার দৃঢ় ধারণা যে, আমার সন্দেহ কিছুমাত্র অমূলক নয়।"

সাহেব বললেন, "তা যদি হয়, তাহলে তুমি তাকে অনায়াসে গ্রেপ্তার করতে পার।"

শঙ্কর বলল, "সে বিষয়ও আপনার সাথে পরামর্শ দরকার। কারণ আমি যাকে সন্দেহ করছি···এই দেখুন···"

শঙ্কর কতকগুলি রিপোর্ট মেলে ধরল সাহেবের কাছে।

সাহেব অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে রিপোর্টটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধীরে-ধীরে বললেন, "তোমার কথা অর্থহীন নয় বুঝতে পারছি।"

শঙ্কর বলল, "তাহলে আর আমি দেরী করতে রাজী নই স্যর! আমাদের আগে ভৈরবীর আস্তানা এবং পরে ভূতুড়ে ডাঙ্গার আস্তানা সার্চ্চ করতে হবে। ভৈরবীর আস্তানায় আমাদের না গেলে তত ক্ষতি হবে না, ওটা হবে বিপক্ষ-দলকে চোখে ধূলো দেবার জন্যে।"

সাহেব বললেন, "বেশ! তাহলে আর দেরী করো না। তুমি বেরিয়ে পড়। এখন না বেরুলে শেষরাতে ওখানে পৌঁছান সম্ভব হবে না। আমিও তোমার সাথে থাকব।"

শঙ্কর বলল, "না স্যর! আপনি সাথে না থেকে পেছনে সদলবলে থাকলেই সুবিধে হবে। কিন্তু আজই সব ব্যবস্থা না করতে পারলে ওরা পালিয়ে যাবে।"

—"বেশ তাই হবে।"

আরো কিছু-কিছু পরামর্শ করে অনুগত জন-কয়েক বাছা-বাছা লোক নিয়ে শঙ্কর চলল তার গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে।

এবারে ট্যাক্সী করে নয়—এবারে চলেছে তারা নিজেদের প্রাইভেট কারে।

মোটর ছুটল—ছুটল দুরন্ত বেগে। সঙ্গে আছে অনুগত সহকর্মী দল। কেবল নারায়ণই নেই শুধু। নারায়ণের জন্য শঙ্করের মন কেঁদে-কেঁদে ওঠে বার-বার।

বড়বাজারের রাস্তা দিয়ে, এবারে হাওড়া-ব্রীজ এদিকে রেখে, মোটর এগিয়ে চলল বর্দ্ধমানের দিকে। অবশ্য বর্দ্ধমান তারা যাবে না। যাবে ভূতুড়ে ডাঙ্গার বিলের কাছের সেই আস্তানায়।

সারাপথ ভাবতে-ভাবতে সে এসেছে। আকাশে অল্প-অল্প মেঘ। কালো আকাশে যেন বর্ষার আগমনী! অন্ধকারের মধ্যে দুরন্ত বিভীষিকার মত ঝক্-ঝক্ করতে-করতে মোটর চলেছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মোটর এসে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছল। শঙ্কর অনুচরদের নিয়ে নামল।

এবার তাদের যেতে হবে সেই বিলের কাছটায়। ইতিপূর্ব্বে মহেন্দ্রের রিপোর্টেই দেখা গেছে যে তারা ভূতুড়ে ডাঙ্গার একটা দলকে সন্দেহ করেছিল। একদিন একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করে মহেন্দ্র দেখেছিল, লোকটা একটা বড় বিলের কাছ দিয়ে একটা বনের মধ্যে ঢুকেছিল!

সেখানে ছিল একটা ভাঙ্গা বাড়ী—বিলের দক্ষিণ দিকে। নারায়ণকে শঙ্কর পাঠিয়েছিল এ দলের সন্ধানেই।

প্রত্যহ ষ্টেশনে যারা যায় যাত্রী হয়ে অথবা অন্য কাউকে বিদায় দিতে, তাদের লিষ্টের মধ্যেও এমন একজনকে পাওয়া গেছে যে বহুদিন এদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুতরাং নরমুণ্ডের আস্তানা এখানেই, তাতে সন্দেহ করার কিছু নেই। সন্দেহভাজন কালুর বাড়ীও ভূতুড়ে ডাঙ্গার পরই সম্মোহনগঞ্জ আর ঘাড়মটকার কাছাকাছি।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারা পথের মাঝে। ভেবে নিল শঙ্কর—মোটরে করে আর এগিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে কি না! না, তা হবে না।

নারায়ণের অবর্ত্তমানে মদনই এখন তার প্রধান সহকর্ম্মী; সেও সঙ্গে এসেছে।

শঙ্কর ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এক কাজ কর মনুয়া, মোটরটাকে চালিয়ে ঐ কলাবাগানের মধ্যে নিয়ে রেখে দাও। ' বেঁচে থাকলে কাল এসে নিয়ে যেও।"

সবাই হাসতে চেষ্টা করল।

না, আর দেরী করলে চলবে না। অতি সন্তর্পণে তাদের অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু সোজা রাস্তায় গেলে ভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তারা রাস্তা ছেড়ে ঝোপ-ঝাপ জঙ্গল ঘেঁসে-ঘেঁসে চলতে সুরু করল।

মুখে কারো বিশেষ কথাবার্ত্তা নেই। সবারই সাথে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, টর্চ্চ প্রভৃতি।

মদন ধীরে-ধীরে চুপি-চুপি বলল, "কিন্তু আমরা যে যাচ্ছি, এমনও ত হতে পারে যে গিয়ে দেখব কেউ নেই!"

শঙ্কর বলল, "হতে পারে; কিন্তু ক'দিন ধরে লক্ষ্য করে থাকবে যে, একদিন বাদে-বাদে এখন হত্যাকাণ্ড চলেছে। আজ বাদ যাবার দিন।"

মদন বলল, "নারায়ণ যদি ধরা পড়ে থাকে, তাহলে ওরা নিশ্চয়ই টের পেয়েছে যে আমরা ওদের আস্তানার প্রতি লক্ষ্য রাখছি। ওরা পালিয়েও ত গিয়ে থাকতে পারে!"

শঙ্কর হাসল, হেসে বলল, "পারে। কিন্তু আমার ধারণা, তারা যায়নি। কারণ, ভৈরবীর আস্তানার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে, এ সংবাদ এদের অজানা থাকার কথা নয়। তাছাড়া এতক্ষণে সেখানে নিশ্চয় সার্চ্চ হচ্ছে। এ-জন্যে তারা কতকটা নির্ভাবনায় থাকতেও পারে! চুপ…"

শঙ্কর, হরেন, মদন, মনুয়া সবাই দেখতে পেল দূরে একটা আলো যেন জ্বলে উঠল! বিলটা এখান হতে দেখা যায়। অন্ধকারের মধ্যে কালো জল চক্-চক্ করছে।

কারা যেন এগিয়ে আসছে! সবাই সরে গিয়ে বনের মধ্যে আশ্রয় নিল। বনের মধ্যে হঠাৎ এরা প্রবেশ করায় কয়েকটা পাখী ডানা ঝট-পট করতে-করতে উড়ে চলে গেল। পাতা আর ঘাসের ওপর সর্-সর্ করে কি যেন গেল একটা! সাপ-টাপ হবে কিছু!

বনের মধ্যে সবাই চুপ করে বসে রইল।

দুজন লোক আসছে। কারা এরা, বোঝা যায় না

অন্ধকারে। একজন বলছে, "না, আজ আর পাহারা দিয়ে কাজ নেই কিছু।"

দ্বিতীয় জন বলল, "তোর মতন ঘুম-কাতুরে দেখিনি ত! সর্দার সাহেব হুকুম দিয়েছে পাহারা দিতে—ভুলে গেলি সে কথা? চল্, ষ্টেশনটা পর্য্যন্ত দেখে আসি একবার। ষ্টেশনেই না হয় ঘুম লাগান যাবে মাষ্টারের ঘরে। শালা মাষ্টারটা মিলেছে ভাল। চল্, নে একটা বিড়ি ধরিয়ে নে।"

দিয়াশলাই জ্বালিয়ে বিড়ি ধরিয়ে বিড়-বিড় করতে-করতে তারা এগিয়ে গেল।

এ সময়টুকু শঙ্কর ওদের কেটেছে একরকম নিঃশ্বাস বন্ধ করে। মদন একবার লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, শঙ্করই তাতে বাধা দিয়েছে; কারণ, এখন গোলমাল করলে আসল কাজই ফাঁক পড়তে পারে।

ধীরে-ধীরে ঝোপ হতে বেরিয়ে আবার তারা চলতে সুরু করল।

এখান হতে পুরানো বাড়ীটা দেখা যায়। ওটাই তাহলে ওদের আস্তানা?

নিস্তব্ধ রাত নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছে। বিলের কালো জলে ঘুমের স্পর্শ। চারদিক শান্ত। সুজলা বসুন্ধরা রাতের নব সৌন্দর্য্যে লীলায়িত।

রাত প্রায় তিনটের মত হবে। মানুষ ঘুমুচ্ছে—পশু-পাখী ঘুমুচ্ছে—ঘুমুচ্ছে পৃথিবী। জেগে শুধু আজ তারা।

ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীটাকে একপাশে রেখে, তারা গিয়ে

দাঁড়াল। একটা প্রাচীরও রয়েছে। নীচেকার একটা ঘর হতে আলো আসছে। লোকজন দেখা যাচ্ছে না কাউকে। কোত্থেকে যেন কার অস্পষ্ট গোঙানী শোনা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে!

কান পেতে রইল শঙ্কর। দমকা বাতাসে একটা পচা দুর্গন্ধ একবার মাত্র অনুভব করেছে তারা। আর গন্ধটা আসছে না।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবল কিছুক্ষণ শঙ্কর। তারপর চুপে-চুপে গম্ভীর হয়ে বলল, "মদন, তুমি আর হরেন এস আমার সাথে। মনুয়া আর বাহাদুর, তোমরা বাইরের দরজার কাছে দাঁড়াও।"

শঙ্কর দুজনকে নিয়ে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুরন্ত অন্ধকার। একটা ফণি-মনসার ঝোপে হাত কেটে গেল শঙ্করের খানিকটা। ধীরে-ধীরে প্রাচীর টপকে তারা গিয়ে হাজির হলো বাড়ীর উঠোনের মধ্যে।

যে ঘরটা হতে আলো দেখা যাচ্ছিল—ঠিক তার সম্মুখেই একটা লোক শুয়ে আছে।

ইঙ্গিতে মদনকে শঙ্কর কি বলতেই মদন পকেট হতে রুমাল বের করে, খানিকটা ক্লোরোফর্ম্ম ঢেলে ঘুমন্ত লোকটার নাকের কাছে চেপে ধরল। লোকটা ধীরে-ধীরে ক্লোরোফর্ম্মের গন্ধে অসাড়ে ঘুমুতে লাগল। তার হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে এক পাশে বেঁধে রাখা হলো।

এবারে ঘরে ঢুকতে হবে।—ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, ঘর বন্ধ নয়! কিন্তু আশ্চর্য্য, লোকজন সব গেল কোথায়? পালিয়ে

গেছে নাকি সব? অন্ততঃ একটা কিছু হয়েছে, এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। আস্তানা বোধ হয় গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে এখান হতে।

দরজায় কান পেতে রইল শঙ্কর। ঘরের মধ্য হতে অল্প-অল্প টুক্-টাক্ আওয়াজ হচ্ছে মাঝে-মাঝে। বুনসেন-বার্ণারে করে কি যেন পরীক্ষা চলছে!

হাতের রিভলভারটা ঠিক করে হঠাৎ তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে ছিলেন আলখাল্লাধারী এক বৈজ্ঞানিক। একটা ল্যাবরেটরী সে ঘরটা। নানান রঙের ও নানান আকারের শিশি-বোতলে ভরা। এক পাশে একখানা কালী-মূর্ত্তি।

ঘরের মালিক বিস্মিত হয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়াল একবার। তারপর হো-হো করে হেসে বলতে সুরু করল, "তুই! আয়, আমি জানতুম তুই আসবি। আয় শঙ্কর, আয়, বোস্।"

শঙ্করও হাসতে চেষ্টা করল, "হ্যাঁ, কথা দিয়েছিলাম আসব। আজও ত যখন গিয়েছিলি তখন বলেছিলাম, আসব। এলাম।"

শঙ্কর সাবধানে ঘরটা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগল। সুন্দর ল্যাবরেটরী। এক পাশে একটা ছোট বিছানা। বিছানার কাছে একটা সুটকেশ।

কোন বাধা দিচ্ছে না বৈজ্ঞানিক। শঙ্করও চিনেছে বৈজ্ঞানিককে। বৈজ্ঞানিকও চিনেছে শঙ্করকে। সেয়ানে সেয়ানে মাসতুতো ভাই!

টাইপরাইটার মেশিন একটা একপাশে। মেশিনের মধ্যে একটা আধালেখা পত্র। শঙ্করকেই লিখেছে সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতে।

কিছু বলছে না বৈজ্ঞানিক। ভাবটা যেন,—ছাখ্, যে-ভাবে ইচ্ছা ছাখ্। যা খুশী কর্।

সুটকেশটা হতে কেমন একটা গন্ধ যেন ভেসে আসছে!

শঙ্কর বলল, "কি আছে রে ওটাতে?"

বৈজ্ঞানিক একটু চঞ্চল হলো; বলল, "তিন বন্ধুতে এসেছিস্। রিভলভার হাতে। আমার নিষেধ বৃথা। ইচ্ছা হয় দেখে নে।"

ধরা পড়েছে কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই তার!

কোথা হতে মিষ্টি একটা গান যেন শোনা যাচ্ছে! নূপুরের বাজনার মত! মিষ্টি, ছন্দোময় মধুর।

শঙ্করও চঞ্চল হয়ে উঠল মনে-মনে। তবু কর্ত্তব্যে বিমুখ হলে চলবে না। সুটকেশটা খুলল সে।

একটা অর্দ্ধ-গলিত মানুষের মাথা। মাথাটা যেন হেসে উঠল একবার! বৈজ্ঞানিক কি করতে চায় একে নিয়ে? মরা মানুষে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে নাকি?

হো-হো করে হাসছে বৈজ্ঞানিক। ক্রমশঃ গম্ভীর হচ্ছে। কঠিন কণ্ঠে বলল, "সবই দেখা হয়েছে তোর? এবার বল্ উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশ্যে পুলিশ বন্ধু নিয়ে আগমন?"

মিষ্টি-মধুর সেই সুরটা এখনও আছে তেমনি। প্রিয়জন কে যেন ডাকছে কাছে যাবার জন্যে!

শঙ্করের কাছে এ স্বর কিছু নূতন নয়। বলল, "আরো আগে আসা উচিত ছিল কিন্তু পারিনি।"

ঘরটা যেন হাসি আর আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে! অনুচরের দলও হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক তাকিয়ে আছে শঙ্করের দিকে। চোখ দুটো বাঘের মত জ্বলছে। বলল, "এ-সবের অর্থ কি শঙ্কর? তোকে বহুবার বহুভাবে আমি বাঁচবার সুযোগ দিয়েছি। প্রতিদানে কি দিতে এসেছিস তুই?"

শঙ্কর বলল, "তোর সাথে কথা-কাটাকাটি করা মানে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা। কিন্তু তুই যে আমাকে হত্যা করিস্‌নি, তার কারণ, তেমন করে সুযোগও পাস্‌নি।"

অনুচর দুটি ওদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

শঙ্করও যেন নিস্তেজ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। বলল, "ওরা ঘুমুচ্ছে ঘুমুক। কিন্তু তুই প্রস্তুত হয়ে নে। তোকে আর সময় দিতে রাজি নই। কিন্তু একটা কথা বলে যা—মৃত আত্মায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে কি লাভ হতো তোর?"

বৈজ্ঞানিক হেসে উঠল; বলল, "মানুষের মহা কল্যাণ। সে কাহিনী তোর শুনে দরকার নেই। পদে-পদে তোর প্রাত্যহিক জীবনে তোকে অনুসরণ করেছিলাম—কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তুই যদি মনে করে থাকিস তুই নিষ্কৃতি পাবি, তবে ভুল করেছিস্‌ বন্ধু!"

পৈশাচিক হাসিতে ঘরটা ভরে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকের চোখে আগুনের শিখা লক্‌-লক্‌ করে শঙ্করকে গ্রাস করতে

আসছে। শঙ্কর আর তার চোখের সামনে তাকিয়ে থাকতে পারছে না!

মৃগশিশু যেন অজগরের কবলে চলে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে! বৈজ্ঞানিক এগিয়ে আসছে।

কম্পিত হস্তে শঙ্কর গুলি ছুঁড়ল বৈজ্ঞানিকের দিকে। আহত সিংহের মত গর্জ্জন করে উঠল বৈজ্ঞানিক। বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল শঙ্করের প্রতি। একটা স্পিরিটের বোতল ছুঁড়ে মারল শঙ্করের মাথায়।

আলোটা কখন নিভে গেছে! মল্লযুদ্ধ চলল সেখানেই কিছুক্ষণ।

মাঝে-মাঝে বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, "আমার এত কালের সমস্ত আরাধনা তুই নষ্ট করলি! আমি চেয়েছিলাম আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে যে-সব অসম্ভব কল্পনাকে অনেকাংশে বাস্তবে রূপায়িত করছে, তাকেই প্রতিফলিত করতে আমাদের দেশীয় প্রথায়। তুই নষ্ট করলি—তুই শয়তান! অন্ততঃ ঐ কোণের বোতল হতে আমাকে আমার তৈরী ওষুধ খেতে দে একটু।"

চীৎকার করে শঙ্কর বলল, "না।"

গুলির পর গুলি চলছে!

বৈজ্ঞানিকও পেয়েছে একটা রিভলভার। অন্ধকারের মধ্যে চলছে তাদের পৈশাচিক নৃত্য আর এলোমেলো গুলি! সহসা একটা গুলি খেয়ে বৈজ্ঞানিক চীৎকার করে দূরে ছিটকে পড়ল।

বাইরে হুইসেল বেজে উঠছে ঘন-ঘন। কমিশনার তাঁর দল নিয়ে বোধহয় এসেছেন!

ঘরের মধ্যে শোনা যাচ্ছে আহত বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠ, "তুই যে একা আসবি না, তা জানতাম। আগেই তাই সব সরিয়েছি। দুর্ভাগ্য তোদের, কোন প্রমাণই তোরা পাবি না এখানকার—শুধু হাওয়ার পেছনেই ঘুরে মরলি!"

শঙ্কর বলল, "হাওয়ার পেছনে আমরা ঘুরিনি বন্ধু, ঘুরেছিস্ তুই! ধ্বংসের ভেতর থেকে অমরত্বের সন্ধান—সে যে অসম্ভব!"

বলেই আবার সে গুলি ছুঁড়ল অন্ধকারের মধ্যেই।

এবার একটা বুকফাটা আর্ত্ত চীৎকার! তার পরেই সব নীরব!

ততক্ষণে লোকজন নিয়ে পুলিশ-সাহেব এসে হাজির হয়েছেন। আলো জ্বাললেন তিনি তাড়াতাড়ি।

দেখা গেল, শঙ্কর পড়ে আছে। কাঁধের কাছে তার একটা গুলি লেগেছে। রক্ত পড়ছে ঝর-ঝর করে। যতীন আর মদন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ঘুম ভেঙ্গে!

আর বৈজ্ঞানিক?—সে পড়ে আছে—অসাড় নিস্পন্দ! একটা গুলি তার বুক ভেদ করে চলে গেছে! কাজেই এক কালু বাদে দলের কেউই তখন ধরা পড়ল না।

সমস্ত বাড়ীটা খুঁজে কোণার অন্ধকার ঘর হতে বেরুল নারায়ণ। না খেতে দিয়ে-দিয়ে তাকে আধমরা করে ফেলা হয়েছে। অন্ধকার ঘরে থেকে-থেকে সে হয়ে উঠেছে রক্তহীন ফ্যাকাশে! কি বীভৎস চেহারা তার! অমানুষিক!

শঙ্করের ক্ষত ভাল করে ধুয়ে ব্যাণ্ডিজ করে, নারায়ণকে ফ্লাস্‌ক্‌ হতে গরম দুধ খাইয়ে একটু চাঙ্গা করে, বাড়ীটার চারদিকে পাহারা রেখে, নিহত বৈজ্ঞানিক অরবিন্দ আর বন্দী কালুকে নিয়ে যখন সবাই ফিরে এল, তখন ভোর হয়ে গেছে।

শঙ্করও ভাল হয়ে উঠল দিন-কয়েকের মধ্যে। নারায়ণও খেয়ে-দেয়ে, জিরিয়ে-ঘুমিয়ে শরীর সারিয়ে নিয়েছে।

ভৈরবীর সে আড্ডা তেমনি এখনও চলছে নিরুপদ্রবে; কিন্তু নরহত্যা কমে গেছে। এখন আর খবরের কাগজ খুললে সেই বীভৎস কাহিনী কারো চোখে পড়ে না।

পনেরো

অনেক দিন পর। মীরা অশরীরী বৈজ্ঞানিকের কথা শোনে শঙ্করদার কাছে। বলে, "আচ্ছা শঙ্করদা, অরবিন্দই যে অশরীরী বৈজ্ঞানিক, এ তুমি বুঝলে কি করে?"

শঙ্কর গম্ভীর হয়। ভাবতেও তার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে; ধীরে-ধীরে বলতে থাকে, "যেদিন আমি এ কেসটা নিলাম, সেদিন হতেই সে আমার পেছু নিয়েছিল। রাস্তায় চলতে তার ডাক শুনে বুঝতাম, এ আর কেউ নয়। যেদিন ট্রেণ হতে লাফিয়ে পড়লাম, সেদিনও আমার খোঁজ নিতে নিজেই গিয়েছিল সে।"

মীরা শুনতে লাগল, আর শঙ্কর বলতে থাকে, "তার কথা-বার্তায়, চাল-চলনে আমার সন্দেহ হয়। তারপর প্রায়ই দেখা যেতে লাগল তাকে ষ্টেশনে। সুব্রতকে দিয়ে অনুসরণ করেই বোঝা গেল যে, অরবিন্দই বৈজ্ঞানিক। ভৈরবীর আস্তানার বিষয়েও তার অহেতুক হাব-ভাব আমাকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। আগা-গোড়া লক্ষ্য করলেই তুমি বুঝতে পারবে মীরা, যে ওর প্রতি সন্দেহ হয়েছে ধীরে-ধীরে এবং হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়েই আমি সিদ্ধান্ত করেছি!"

নারায়ণ কিছু বলে না। চুপ করে থাকে। সেই বীভৎস দিনের কথা মনে হলে এখনও ঘাম আসে!

এখনও মনে তাদের প্রকাণ্ড দুঃখ! এ হত্যাকাণ্ডের নায়কই

গেছে পৃথিবী থেকে পালিয়ে! কালুর সাহায্যে অবশ্য অনেকেই ধরা পড়েছে। দীর্ঘ দিনের মেয়াদে তাদের জেল বা দ্বীপান্তর হয়েছে। কালু, সেই লিক্‌লিকে ষ্টেশন-মাষ্টার, খোন্দা, বান্দা—কেউ বাদ যায়নি। কিন্তু লোকগুলোর মৃতদেহ কোথায় কি-ভাবে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে, কিছুই টের পাওয়া যায় নি।

বড়সাহেব খুশী হয়েছেন; বলেন, "উপযুক্ত লোকের হাতেই যে আমি তদন্তের ভার দিয়েছিলাম, তাইতেই আমার আনন্দ!"

পৃথিবী যেন জুড়িয়েছে শান্তিতে!

তবু আজও যখন ভূতুড়ে ডাঙ্গা দিয়ে ট্রেণ চলে, নিশীথ-রাত্রির সেই অন্ধ অবগুণ্ঠন-তলে কারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে! একটা ভয়ার্ত্ত শীতল থম্‌থমে ভাব অহেতুক ভাবেই সবাইকে ম্রিয়মাণ ও আচ্ছন্ন করে তোলে! ভূতুড়ে ডাঙ্গার বিলের ওপাশে দক্ষিণের সেই পোড়ো বাড়ীটায় মৃত গলিত শবদেহগুলি যেন ভৌতিক নৃত্য সুরু করে দেয়!

দিনের বেলাও সেখানে যেতে মানুষের ভয় করে!

শেষ